মাতৃ-তীর্থ।

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
প্রণীত।

রাজসাহী গোবিন্দধাম হইতে
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৺কাশীধাম
রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, বীণাপাণি আফিস হইতে
শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৫ সন।

মূল্য ৸০

উৎসর্গ।

যিনি আমার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাকে ব্রহ্মচর্য্য
আশ্রমের মাহাত্ম্য প্রচারে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন; যিনি
স্বয়ং দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দুর্দ্দশায়
ব্যথিত হইয়া উহার প্রতীকার কল্পে ব্রহ্মচর্য্য
আশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের
সমস্তশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন,
আমার সেই পরমপূজনীয়
আধ্যাত্মগুরু
শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের
শ্রীপাদপদ্মে
এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

মাতৃতীর্থ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—— :*: ——
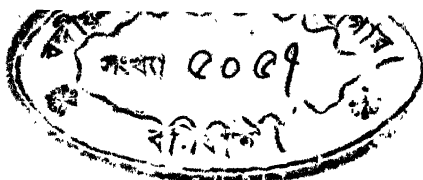
রণরঙ্গিণী পদ্মার তীরে কুমারডাঙ্গা গ্রাম। গ্রামটী অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে ইহার আয়তন যেমন বিশাল, সমৃদ্ধিও তেমনি খুব বিশালই ছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সে অবস্থা নাই; খরস্রোতা পদ্মানদী গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশ স্বীয় অঙ্গে সম্মিলিত করিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বের ছায়াশীতল আম্রকাননের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বালুকাময় ঝাউবন এবং তাল ও নারিকেল কুঞ্জে গ্রামটী পরিপূর্ণ। লোকালয়ের সংখ্যা অতি অল্প, কেবল সামান্য কয়েকটী গৃহস্থের পর্ণকুটীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্ম্মিত।

এই কুমারডাঙ্গার একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের অঙ্গণে নারিকেল বৃক্ষের নীচে বসিয়া একটী যুবক জনৈকা বর্ষীয়সী নারীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন সূর্য্যদেব সারাদিনের লীলা অবসানে লোহিত রশ্মিজালে মণ্ডিত হইয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ভীমনাদিনী পদ্মানীরে তাহারই প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া একটা কুহেলি-পূর্ণ ছায়ালোকের সৃষ্টি হইয়াছে। ঝাউবনের অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনিতে পৃথিবীর কি যেন অব্যক্ত বেদনা গুমরিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার উদ্দাম

বায়ুপ্রবাহ অশ্রান্তবেগে গ্রামের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপরে নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশে বসিয়া কতকগুলি শালিক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তুমুল কলরব তুলিয়া সমস্ত গ্রামটী মুখরিত করিয়া ফেলিয়াছে। যুবক সদ্য উন্মুক্ত পার্শ্বেল হইতে কয়েকখানি স্বুবর্ণ অলঙ্কার বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সঙ্কুচিতা বৃদ্ধার কথার দুই একটী উত্তর প্রদান করিতেছেন। এই যুবক কুমারডাঙ্গা গ্রামেরই ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর; আর বর্ষীয়সী বীরেশ্বরেরই মাতা হরিপ্রিয়া দেবী।

ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন অতি দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরেশ্বর উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাসে মাসে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলেও কখনও সংসারের খরচের জন্য এক কপর্দ্দকও পাঠাইতেন না। ফলে বড় কষ্টে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইত। বহুকাল এই ভাবে তীব্র দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইয়া অতিরিক্ত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন ঈশানচন্দ্র অবশেষে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। এতদিন তিনি স্থানীয় জমিদারের অধীনে সামান্য দশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী করিয়া বড় কষ্টে সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি সাংঘাতিক পীড়া-নিবন্ধন চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় সংসারের কাহারও মুখে অন্ন উঠা ভার হইল। ঈশানচন্দ্র নিজের পীড়ার কথা জানাইয়া পুত্রকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন; এবং বাড়ী আসিতে একান্ত অসমর্থ হইলে কিছু টাকা পাঠাইবার কথাও লিখিয়া দিলেন। কিন্তু বীরেশ্বর কোনকালেই পিতার পত্রোত্তর দিতেন না; এবার তাঁহার এই সাংঘাতিক পীড়ার

সংবাদেও তাহাই করিলেন। ফলে সুদীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অচিকিৎসায় ঈশানচন্দ্র ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

বীরেশ্বর পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার শ্রাদ্ধের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে একমাসের বিদায় লইয়া গৃহে আগমন করিলেন, এবং যথাসময়ে পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে সম্পন্ন করিয়া কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বীরেশ্বরের যাত্রার পূর্ব্বদিন তাঁহার মাতা হরিপ্রিয়া দেবী আসিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন,—"বাবা, এখন আমরা দুইটী স্ত্রীলোক একা খোকাকে লইয়া কেমন করিয়া এ বাটীতে অবস্থান করিব? তুমি আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া তোমার বাসায় লইয়া চল। শুধু আমি একা হইলে ত কোন ভাবনাই ছিল না; কিন্তু ভুবনের এই কাঁচা বয়স, তাহার উপর গ্রামে যত বদমাইসের আড্ডা। এমন অবস্থায় দুইটী অসহায়া স্ত্রীলোকের একাকী এ বাটীতে অবস্থান কখনই নিরাপদ নহে।" বীরেশ্বর তখন তাঁহার পত্নীর জন্য ক্রীত অলঙ্কারগুলি লইয়া এতই তন্ময়-চিত্ত হইয়াছিলেন যে মাতার প্রশ্ন তাঁহার কর্ণগোচর হইল কিনা সন্দেহ। উত্তর না পাইয়া যখন হরিপ্রিয়া তাঁহার কথাগুলি পুনরুক্ত করিলেন, তখন বীরেশ্বর নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—"আমার টাকা এত বেশী হয় নাই যে, তোমাদের একপাল লোক লইয়া গিয়া সেখানে পুষিতে পারি। এখানে থাকিতে হয় থাক, আর না থাকিতে হয় যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।" হরিপ্রিয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"বাবা, এইজন্যই কি তোকে এত দুঃখ কষ্ট করিয়া মানুষ করিয়াছিলম? আমা-দিগকে—" বীরেশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন,—"মানুষ করিয়াছিলে ত' কি হইবে? এখন মাথায় করিয়া নাচিতে হইবে নাকি? অত কান্নাকাটী

আর ভাললাগে না ; না থাকিতে পার সোজা রাস্তা দেখ।” এই বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

ইহার পরদিন বীরেশ্বর পত্নী প্রমীলাসুন্দরী এবং শাশুড়ী মোক্ষদা দেবীকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যস্থল লক্ষ্ণৌএ রওনা হইলেন। ষ্টেশনে যাইবার জন্য যখন তাঁহারা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে হরিপ্রিয়া দেবী সেইস্থলে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিলেন ;—“বাবা, আমাদিগকে সঙ্গে ত’ লইয়া গেলিনে ; এখন এখানে থাকিয়া আমাদের তিনিটী লোকের পেট চলিবে কি প্রকারে ? মাসে মাসে কিছু খরচ না পাঠাইলে ত’ আর চলিবে না।” বীরেশ্বর চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“দেখ, আক্কেলটা দেখ, যাবার সময় আবার কান্না জুড়িয়া দিয়া আমাদের অমঙ্গল করিতে বসিল।” তারপর মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“হাঁ, টাকা পাঠাইব বই কি ? তুমি তোমার যত কিছু আছে, সব মেয়েকে দিতে থাক, আর আমি মাসে মাসে তোমার নামে টাকা পাঠাইয়া দিব !” এই বলিয়া তিনি কোচ্ম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া চলিয়া গেল ; হরিপ্রিয়া সেই স্থানেই বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে"—

"ঘরে যে কিছুই নেই বাবা"

"তাহলে আজ আমি স্কুলে যাব কি খেয়ে ?"

"বনথেকে ক'টা পেয়ারা পেড়ে নিয়ে এসেছি; তাই মুখেদিয়ে একটু জলখেয়ে এখন স্কুলে যাও বাবা; আমি গাঙ্গুলীদের বাড়ী যাচ্ছি; দেখি যদি চারিটী চাউল ধার পাই, স্কুলথেকে এসে খেও এখন।"

হরিপ্রিয়ার দৌহিত্র, তাঁহার বিধবা কন্যা ভুবনমোহিনীর একমাত্র পুত্র আট বৎসরের বালক প্রবোধ ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত হইয়া মার নিকট খাবার চাহিতেছিল; মা বিষণ্ণ বদনে অশ্রুশিক্ত নয়নে পুত্রকে প্রবোধ দিতেছিলেন;—ঘরে খাবার কিছুই ছিল না, তাই পুত্রের কথায় ভুবনমোহিনীর অন্তঃকরণ দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি পুত্রকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিয়া তপ্ত অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গাঙ্গুলীদের বাড়ী গমন করিলেন। বড় গিন্নীর দেখা পাইয়া বলিলেন,—"বড়মা, আজ আমাদের ঘরে কিছুই নাই; চারিটী চাউল ধার দিন, আমার প্রবোধ আজ না খাইয়া স্কুলে গিয়েছে।" বড়গিন্নী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন;— "সেকি ভুবন, বীরেশ্বর কি তোদের জন্য বাড়ীতে খরচপত্র কিছুই পাঠায় না ?" ভুবনমোহিনী হৃদয়ভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয় বলিলেন, "সেসব কথা শুনিয়া আর কি করিবেন বড়মা ? আমাদের দুঃখের কথা বলিতে গেলে দুই একদিনে ফুরাইবে না। দাদার কথা

বলিতেছেন? তিনি যদি মানুষই হইবেন, তবে আর আমাদের এ দশা হইবে কেন?" বড়গিন্নী সমধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"সেকি ভুবন! আমরা যে একথা একদিনও শুনি নাই। তা বীরেশ্বর অতবড চাকরী করিতেছে, আর বাড়ীতে মা বোনের খরচ পাঠায় না! একথা শুনিলে যে লোকে ছিছি করিবে। বিয়ে করিতে করিতেই কি মা বোন পর হইয়া গেল?"

বিষাদের মলিন হাসি হাসিয়া ভুবনমোহিনী কহিলেন, "বড়মা সেসব কথা বলিতে গেলেই অতীতের নির্ম্মম স্মৃতি আসিয়া দারুণ হৃদয় বেদনা উপস্থিত করে। বাবার মৃত্যুর পর হইতে এই দীর্ঘ ছয়মাসকাল কি ভাবে যে আমাদের সংসার চলিয়াছে, তা একমাত্র অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন। বড় দুঃখেও এসব কথা এতদিন কাহারও নিকট কহি নাই। তবে আজ যখন আপনি নিজে হইতে এসব কথা উঠাইলেন, তখন সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া ভুবনমোহিনী পিতার মৃত্যু, বীরেশ্বরের গৃহে আগমন, তাঁহাদিগকে কার্য্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে বীরেশ্বরের উত্তর, এবং পত্নী ও শাশুড়ীকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রাকালে মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার, এ সকল কথা যথাযথভাবে বড়গিন্নীর নিকট বিবৃত করিলেন। কথা বলিতে বলিতে দুঃখে ও ক্ষোভে এক একবার ভুবনমোহিনীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। বড় কষ্টে ভুবনমোহিনী তাঁহার বাক্য শেষ করিয়া বলিলেন,—"বড়মা! এখন বুঝিলেন ত', আমাদের মত দুঃখিনী আর এজগতে দ্বিতীয় নাই? আমাদের এখন গতি কি হবে বড় মা?" বড়গিন্নীর বড় লোকের ঘরে বিবাহ হইলেও তিনি আশৈশব দরিদ্রের কন্যা ছিলেন, তাই তিনি দরিদ্রের মর্ম্মকাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন; ভুবনমোহিনীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,

"ভুবন! তোরা কোন দুঃখ করিস্‌নে বাছা; আমাদের বাড়ীতে ছেলেদের জন্য প্রত্যহ স্কুলের ভাত হইয়া থাকে, প্রবোধ যেন আসিয়া দুবেলা আমাদের বাড়ী খাইয়া যায়। আহা, প্রবোধ দুধের ছেলে; তার কি কোন কষ্ট দেখা যায়? আর তোদেরও আজ আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রহিল। যা, সকালে সকালে স্নানাহ্নিক সেরে তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে আয়। আর দ্যাখ, যখন তোদের যা কিছুর অভাব হয়, আমাকে আসিয়া বলিস্।" এই বলিয়া বড়গিন্নী ভুবনমোহিনীকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া তাহার আঁচলে জোর করিয়া দশটী টাকা বাঁধিয়া দিলেন। তারপর তাহাকে করুণাপূর্ণ মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "এখন তবে যা ভুবন, সকালে সকালে তোর মাকে সঙ্গে করিয়া আয়গে।" ভুবনমোহিনী ভক্তিভরে বড়গিন্নীর পদধূলী মাথায় লইলেন, তারপর নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এমনই ভাবে বড় দুঃখে ও বড় কষ্টে হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনীর দীর্ঘ দুইবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। দুই বৎসর পরে একদিন হরিপ্রিয়া পুত্রের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। বীরেশ্বর লিখিয়াছেন,—"বউ এই আট মাসের পোয়াতী; আগামী পৌষ মাসে সন্তান হইবার সম্ভাবনা। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর ধাতে পরিশ্রম আদৌ সহ্য হয় না; তাই প্রসবের সময় বউকে অন্নজল দিবার জন্য তোমার এখানে আসা দরকার। আমার শ্যালক রামচরণকে সঙ্গে করিয়া তুমি পত্রপাঠ এখানে রওনা হইয়া আসিবে। ভুবন বাড়ীতেই থাকুক; সে ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ হইবে না। রেলের মাশুলাদি বাবদ আবশ্যকমত টাকা অদ্য রামচরণের নিকট মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম। ইতি।" সুদীর্ঘ দুইবৎসর পরে বীরেশ্বরের এই পত্র পাইয়া, এতদিন পরে তাহার আবার মার কথা মনে হইয়াছে দেখিয়া হরিপ্রিয়া আনন্দে গলিয়া গেলেন। তিনি এতদিন ধরিয়া পুত্রের ব্যবহারে যে অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত কষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, আজি পুত্রের এই পত্র পাইয়া সে সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া পুনরায় তাহার মঙ্গল কামনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধন্য মাতৃস্নেহ, এ সংসারে তোমারই তুলনা নাই! এই দুরন্ত আধিব্যাধি প্রপীড়িত অনন্ত দুঃখের আগার কর্কশ সংসার ক্ষেত্রে যদি স্বর্গ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা জননীর স্নেহ শীতল অঙ্ক—তাহা মতৃস্নেহ।

হরিপ্রিয়া পুত্রের এই পত্র পাইয়া একদিকে যেমন আনন্দিতা হইলেন, ভুবনমোহিনীকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া অন্যদিকে তেমনি ঘোর চিন্তান্বিতা হইলেন। বীরেশ্বর স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছে, ভুবনমোহিনীকে যেন বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া হয়; কিন্তু যুবতী কন্যাকে একাকিনী সেখানে ফেলিয়া যাওয়াও কোনমতেই সঙ্গত বোধ করিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে হরিপ্রিয়া স্থির করিলেন যে, ভুবনকে তিনি সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাইবেন। বড়জোর বীরেশ্বর ইহাতে তাঁহাকে দুই চারিটী কথা বলিবেন। যুবতী কন্যাকে সঙ্কটপূর্ণ গ্রামে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া অপেক্ষা তিনি পুত্রের নিকট দুই চারিটী 'বকুনী' খাওয়াই অধিকতর সুবিধা বলিয়া মনে করিলেন।

যথাসময়ে হরিপ্রিয়া কন্যা ও দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্ণৌয়ে পুত্রের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা মনে করিয়াছিলেন যে, এবার বীরেশ্বর মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, তিনিও দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইবেন। কিন্তু পুত্রের বাসায় উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার কোন লক্ষণই দেখিলেন না;—গাড়ী—হইতে অবতরণ করিয়া গৃহদ্বারে জনমানবেরও সাক্ষাৎ পাইলেন না। রামচরণ তাঁহাদিগকে সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া একাকী অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। ইহার অল্পক্ষণ পরে বাটীর ঝী বাহির হইয়া আসিল এবং সকলকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। গৃহটী এতই অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় যে তাহা মনুষ্য বাসের আদৌ উপযোগী নহে। পূর্ব্বে গৃহটী বীরেশ্বর বাবুর অশ্বশালারূপে ব্যবহৃত হইত; সম্প্রতি মাতার আগমন সম্ভাবনায় তিনি উহা খালি করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহের এক পার্শ্বে একটী মাচাং, তাহার উপরে রাশীকৃত

শুষ্ক গোময় ও জ্বালানী কাষ্ঠ স্তূপীকৃত রহিয়াছে। চারিদিকে মূষিকের দৌরাত্ম্য। সম্মুখে ক্ষুদ্র একটু অঙ্গন, তাহার পরেই উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের অপর পারে সুবৃহৎ সুসজ্জিত ইন্দ্রভবন তুল্য বক্ষে বীরেশ্বর বাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ীর বাসগৃহ। হরিপ্রিয়া তাঁহার এই নূতন বাসগৃহের অবস্থা দেখিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝী আসিয়া চাউল, ডাল ও তরকারী এবং রন্ধনের জন্য আবশ্যকীয় সমস্ত বাসন ও জ্বালানী কাষ্ঠ রাখিয়া গেল। ঝী ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ভুবনমোহিনী তাহাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা! তোমার বাবুকে একবার আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে বল।" ঝী স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবুর এখন আপিশে যাইবার সময়; তিনি আপনাদের সঙ্গে এখন দেখা করিতে পারিবেন না।" হরিপ্রিয়ার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তিনি হৃদয়ে যে বেদনা পাইলেন, লক্ষ বৃশ্চিকের এককালীন দংশনও বুঝি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রমীলাসুন্দরী তাঁহার মার সহিত শ্বাশুড়ী ও ননদের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন; বলিতেছিলেন,—"দেখলে মা; শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণের আক্কেলটা? আবার গাঁ শুদ্ধ লোককে সঙ্গে করে আনা হয়েছে। আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে ওসব আপদ বালাই এনে কাজ নাই; ক' মাসের জন্য একটা পাচক বামুন রাখিলেই চলিবে। তা আমার কথা তখন ভাল লাগলো না—আবার মাকে লইয়া চলাইতে গেলেন; এখন দেখুক কেমন মজা;—গাঁ শুদ্ধ লোককে ভাত দিতে হবে।

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন আমার ত' সেই ইচ্ছাই ছিল বাছা; তা বিরুর কি মত হ'ল, বল্লে অনর্থক পাচক রাখিয়া কি হইবে, মাকে আনিলেই চলিয়া যাইবে। এত আপদ বালাই সঙ্গে আসিবে জানিলে কি আর আমি তাহাকে একাজ করিতে দিতাম? আর মাগীরই বা কি ধন্যি সাহস বাবা; বীরুত স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিল যে কাহাকেও যেন সঙ্গে করিয়া আনা না হয়; তবু এক পাল লোক সঙ্গে করে এনেছে। যেমন আক্কেল, এখন মরুক ঝাঁটা খেয়ে।

প্রমীলা।—আসুক আগে আপিশ থেকে, আমি বলিতেছি যে, এসব আপদ বালাই রাখিয়া দরকার নাই; এখনই দূর করিয়া দেওয়া হউক। না হয় প্রসবের সময় আমি অন্নজল নাই পাইলাম; তবু আমি এসব আপদ জঞ্জাল দেখিতে পারিব না। আর ওঁকেই কি তুমি কম

মনে কর! একটা পাচক বামুন রাখিলে মাস মাস মাহিনা দিতে হইবে, তাই এখন মাকে আনা হ'ল। একটা ছেলে আমার পেটে রয়েছে; তবু এই সময় আমার মনে কষ্ট না দিলেই নয়। আজই যদি এসব জঞ্জাল দূর করিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

প্র—মা। মাটি! ওসব কি কথা মা! বীরু আফিশ থেকে আসুক, আমি তাহাকে বলিতেছি যে এই সন্ধ্যার গাড়ীতেই এদের সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হউক। আর পাচক বামুন না রাখিতে চায়, আমি নিজেই তোর প্রসবের সময় অন্নজল দিব। আমারই একটু কষ্ট হইবে বইত নয়?

প্রমীলা।—বামুন রাখিবে না, কেন রাখিবে না? অবশ্য রাখিবে—আমার হুকুম রাখিতে হইবে।

প্র—মা। তুই রাগ করিসনে বাছা, আমি বীরুকে সেই কথাই বলিতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বীরেশ্বর আপিশ হইতে ফিরিবামাত্রই প্রমীলাসুন্দরী যাইয়া তাঁহার কর্ণে রীতিমত বিষধারা বর্ষণ করিলেন; শেষে বলিলেন,—"এই সব আপদ জঞ্জাল এখনই দূর কর, নতুবা আমি বিষ খাইব।" বীরেশ্বর সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, অপ্রফুল্লচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। বীরেশ্বরকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রমীলাসুন্দরী বলিলেন,—"ও, তবে আমিই বুঝি তোমার পর হইলাম? বেশ, তবে আমি সত্য সত্যই মরিব। এই দেখ আমি মরিতে পারি কিনা।" এই বলিয়া প্রমীলাসুন্দরী আলমারীর ভিতর হইতে একটা কার্ব্বলিক অ্যাসিডের শিশি বাহির করিয়া তাহা মুখে ঢালিতে যাইতেছিলেন. এমন সময়ে বীরেশ্বর "সর্ব্বনাশ! ওকি কর! ও কি কর!" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। প্রমীলাসুন্দরী চিৎকার করিয়া বলিলেন,—"ছেড়ে দাও আমার হাত, আজ আমি মরিব, কেহ আমাকে বাঁচাইতে পারিবে না।" বীরেশ্বর কার্ব্বলিক অ্যাসিডের শিশিটা প্রমীলাসুন্দরীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"তোমায় মরিতে হইবে না; তুমি যাহা বলিলে, তাহাতেই আমি স্বীকৃত। এখনই আমি ওদের বাসা হইতে দূর করিয়া দিতেছি।" প্রমীলাসুন্দরী পুনরায় উচ্চৈস্বরে বলিলেন;— "না, কাহাকেও দূর করিয়া দিতে হইবে না; বিষ খাইতে না দাও, গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" এ দিকে কন্যার চিৎকার শুনিতে পাইয়া প্রমীলাসুন্দরীর মাতা দৌড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং

কন্যা ও জামাতাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাপরে বাপ, কে আছ, আমার মেয়েটাকে মেরে ফেল্লে।" শ্বাশুড়ীর এই অভিনব ব্যবহার দেখিয়া বীরেশ্বর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। প্রথম বিস্ময় অপনোদিত হইলে তিনি জোড় করে শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন।" শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী ক্রন্দনের মাত্রা আরও সপ্তমে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাপু! আগে মেয়েটাকে ত বাঁচাও; তারপর যাহা বলিতে হয় বলিও।" তখন বীরেশ্বর স্বামী হইয়া দুই হস্তে পত্নীর চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন; বলিলেন,—"আমার ঘাট হইয়াছে, আমায় মাপ কর।" কিন্তু এততেও প্রমীলাসুন্দরীর রাগ কিছুমাত্র পড়িল না; তিনি সজোরে স্বামীর হস্তমধ্য হইতে আপনার চরণদ্বয় ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করায় বোধহয় বীরেশ্বর বাবু তাঁহার সেই অলক্তকরঞ্জিত চরণের একটা ছোট রকম লাথিও খাইলেন। যাহা হউক বীরেশ্বর বাবুর যথেষ্ট সৎসাহস ছিল, তাই তিনি লাথি খাইয়াও পত্নীর চরণদ্বয় ছাড়িলেন না; বলিলেন;— "বল যে তুমি আমায় ক্ষমা করিলে; নতুবা কিছুতেই আমি তোমার পা ছাড়িব না।" তখন প্রমীলাসুন্দরী গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"নাও হইয়াছে, আর বেশী চলাইতে হইবে না। এখন দেখা যাউক, কেমন নিজের কথামত কাজ কর।" তখন বীরেশ্বর পত্নীর পদদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া যে ঘরে তাঁহার মা ও ভগ্নী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গৃহের দিকে গমন করিলেন।

বীরেশ্বর মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন,— "তোমাদের আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই। এই সন্ধ্যার গাড়ীতেই তোমাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" সহসা

পুত্রের মুখে এই নিদারুণবাণী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি আপনার বসনাগ্রভাগে চক্ষের জল মুছিয়া জননী-সুলভ স্নেহময় মধুর কণ্ঠে কহিলেন ;—“বাবা! তোর মুখ দেখিয়া একটু সুখে থাকিব বলিয়াই এত কষ্ট করিয়া তোর বাসায় আসিয়াছি। দিন কতক এখানে থাকি, তারপর না হয় আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইব।” বীরেশ্বর কতকটা ঘৃণা ও কতকটা অবজ্ঞাভরে বলিলেন;—“রেখে দাও তোমার ওসব মায়া কান্না ; আমি আর ওসবে ভুলিবার পাত্র নহি। তোমার কান্না দেখেই ত আর বাড়ীখানা ছারেখারে দেওয়া যায় না ? এখন গাড়ী ডাকিতে গিয়াছে, শীঘ্র তোমরা প্রস্তুত হও।

মা। দেখ্ বাবা, আজ দুই দিন হইতে চলিয়াছে, ভুবন ও আমি চক্ষে পাতা ফেলি নাই। আমি বুড়া হইয়াছি, মরিবার বয়স হইয়াছে ; আমি না হয় আরও দুই দিন এই ভাবেই কাটাইলাম ; কিন্তু ভুবন ছেলেমানুষ, সেত আর পারিবে না। এ বেলাটা থাকিতে দে, পরে কাল প্রভাতের গাড়ীতে আমরা রওনা হইয়া যাইব।

বীরেশ্বর। আর এর মধ্যেই যদি বাড়ীখানাতে কেহ আগুন লাগাইয়া দেয়, অথবা যাহা কিছু সেখানে আছে সব চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে কি হইবে? বুড়াত হইয়াছ, কিন্তু এ হুঁসটুকুও কি তোমার নাই? তোমাদেরই ভালর জন্য বলিতেছি ; আর বৃথা ওজর আপত্য করিও না। বাড়ীতে যদি কোন লোক থাকিত, তাহা হইলে তোমরা দশ বৎসর এখানে বসিয়া থাকিলেও কোন আপত্যের কারণ ছিল না। এখন আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না ; শীঘ্র তোমরা প্রস্তুত হও। রামচরণ যাইয়া টিকিট কাটাইয়া দিয়া আসিতেছে, তোমরা এই ট্রেণেই, রওনা হইবে।

মা। সেকি বাবা, রামচরণ কি আমাদের সঙ্গে যাইবে না?

বী। না, আমার টাকা এত বেশী হয় নাই যে তোমাদের সঙ্গে দুই চারিজন দাসী চাকর পাঠাইতে পারি।

মা। তাহলে বাবা আমরা দুটী মেয়েমানুষ এই দুদিনের রাস্তা কি ক'রে একা একা যাব? আর ভুবনের এই কাঁচা বয়স, জানইত রেলপথে চারিদিকেই পিশাচের লীলা।

বী। সব জানি, কিন্তু জানিলেও কোন ফল নাই। তোমাদিগকে যাইতেই হইবে; আর না যাও, অন্ততঃ আমার বাটীর বাহির হইতে হইবে।

মা। ছেলে হয়ে বুড়া মাকে এমন কথা বল্লি বাবা? তোকে না আমি দশ মাস দশ দিন পেটে করে মানুষ করেছিলাম?

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা আর সহ্য করিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বী। নাও, রেখেদাও তোমার মায়া কান্না, নতুবা ভাল হবে না বল্‌ছি।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বীরেশ্বরকে সংবাদ দিল—"গাড়ী প্রস্তুত।" বীরেশ্বর ভৃত্যকে বিদায় করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন,—"নাও, বেরুবে কিনা বল; বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা কচ্ছে।"

বৃদ্ধা বিষণ্ণ বদনে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। ভুবনমোহিনী বসনাগ্রভাগে চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, "নাও চল, যাহা কপালে আছে তাহাই হইবে; এখন এখানকার যন্ত্রণার হাত হইতে ত অব্যাহতি পাই।" তখন তিনজনে যাইয়া ঠিকা গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে রামচরণ ষ্টেশনে যাইয়া তিনখানি টিকিট ক্রয় করতঃ সকলকে সন্ধ্যার গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া স্বয়ং বাসায় প্রত্যাগমন করিল।

এ দিকে হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। বীরেশ্বর তাঁহাদিগের সহিত যে ঘৃণিত পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিলেন—যে নিদারুণ মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই কথা মনে করিয়া তাঁহারা এমন মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন যে তুষানলে দগ্ধ হওয়াও বুঝি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

এমনই ভাবে সমস্তরাত্রি রেলগাড়ীতে বিনিদ্র চক্ষে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ইহারা ভারতের পবিত্রতীর্থ বারাণসী নগরে উপনীত হইলেন। ভুবনমোহিনী মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এইস্থানে নামিয়া গঙ্গা-স্নানাদি করা যাউক।"

হরিপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এই কি কাশী?"

ভুবনমোহিনী কহিলেন,—"হাঁ এই কাশী।"

হরিপ্রিয়া ভক্তিভরে যুক্তকরে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিলেন; তারপর তিন জনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইলেন। বারাণসীর রাজপথে তখন গঙ্গাস্নানার্থী যাত্রীর দল ভক্তিপূত চিত্তে 'জয় বিশ্বনাথের জয়' 'জয় অন্নপূর্ণার জয়', 'হর হর বোম্ বোম্' প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের শব্দ করিতে করিতে একাগ্রমনে গঙ্গার দিকে চলিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের বিচিত্র সৌধমালা

সারারাত্রি শিশিরে স্নাত হইয়া এক্ষণে উষার আলোকে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে প্রভাতী আরতী আরম্ভ হইয়াছে; কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খের মধুর বাদ্যের সঙ্গে ধূপ ধূনার সুগন্ধ মিলিত হইয়া সুপ্তোত্থিত নগরবাসীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। বারাণসী নগরী তখন যেন আত্মহারা হইয়া নিবিষ্ট মনে বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছে। ক্রমে তিনজনে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ঘাটে তখন রীতিমত যাত্রির ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ স্নানান্তে গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছে, কেহ তীরে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছে; কেহ সবে ঘাটে আসিয়া পৌছিতেছে; কেহ বা গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিতেছে। ঘাটের উপর পাণ্ডা ঠাকুরেরা এক একটী প্রকাণ্ড বাঁশের ছাতার নীচে এক একখানি চৌকি পাতিয়া তাহার উপরে ফুল ও চন্দনাদি লইয়া বসিয়া আছে; এবং যাত্রীগণ স্নান করিয়া উঠিলেই 'আসেন বাবু' 'আসেন মা' 'এইখানে ফোঁটা দিন' প্রভৃতি বলিয়া যাত্রী-সংগ্রহ করিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। সকলেরই মুখে একটা অব্যক্ত আনন্দের চিহ্ন; কেবল হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী সেই আনন্দের হাটেও নিরানন্দ। বারাণসীর রাজপথের দৃশ্য বা গঙ্গাগর্ভের এই অতুল শোভা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিলেন না। কত সুরম্য হর্ম্ম্যমালা, কত বিচিত্র বর্ণের মন্দির গঙ্গাগর্ভ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; নগরাভ্যন্তরে কত কত গম্বুজ, কত কত মন্দির, কত কত প্রাসাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ঐ যে সমগ্র বিশ্বনাথের পুরী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জাহ্নবীকূলে দাঁড়াইয়া একখানি উজ্জ্বল মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে; ঐযে পূর্ব্বদিক লোহিতরাগে মণ্ডিত করিয়া তরুণ অরুণ শতবর্ণে গগণপথে ফুটিয়া উঠিতেছে; হরিপ্রিয়া ও

ভুবনমোহিনীকি একবারও সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন? দেখিতে পারিলেন কৈ? অন্তর যে তখন তাঁহাদের পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। নীরবে বিষণ্ণ মনে তিনজন গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন।

হরিপ্রিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া যুক্ত করে মা গঙ্গাকে অসংখ্য প্রণিপাত করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"মা কলুষনাশিণী গঙ্গে! তুমিত অনন্তকাল এমনই ভাবে বহিয়া যাইতেছ; কত পাপী-তাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছ; আমার এ দুঃখ তুমি দূর করিবে না মা? তুমিত অনাদিকাল হইতে জগতের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আসিতেছ; আমার বীরেশ্বরের মত এমন অকৃতজ্ঞ পুত্র কি আর কখনও দেখিয়াছ মা? পুত্র হইয়া জননীর প্রতি কি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার আর কেহ কখনও করিয়াছে মা? আমার এ অবোধ পুত্রের কি দশা হইবে মা? তুকি কি তাহাকে উদ্ধার করিবে না?"

ভুবনমোহিনী মা গঙ্গাকে আপনার অনন্ত হৃদয় বেদনা জানাইতে লাগিলেন; অহরহঃ যে তুষের আগুণে পুড়িতেছিলেন, মা গঙ্গার নিকট আপনার সে অনন্ত যন্ত্রণা-কাহিনী জানাইয়া তাহার শান্তি কামনা করিলেন। যুক্তকরে গললগ্নী-কৃতবাসে মাকে মনে মনে অসংখ্য প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "মা! কেন আমি অকালে বিধবা হইলাম? কোন্ পাপে আমি ইহকালের সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিতা হইলাম? কি দোষে নারীজাতির অমূল্যরত্ন প তদেবতার পূজার অধিকারও হারাইয়া বসিলাম? কোন্ সুখের আশায় আর আমি এ কর্কশ সংসারক্ষেত্রে থাকিতে চাহিব? যেদিন আমার সংসারের সর্ব্বপ্রধান স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, যেদিন আমি আমার ইহকালের সর্ব্বস্বধন স্বামীদেবতাকে তোমার সৈকতভূমে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছিলাম, সেই দিনের সেই কালমূহূর্ত্ত হইতে জীবন

আমার পক্ষে দুর্ব্বহ ভাররূপে পরিণত হইয়াছে। আমার এ অনন্ত দুঃখ, অনন্ত যন্ত্রণার মধ্যেও কেবলমাত্র প্রবোধের মুখ দেখিয়া সকলই নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু প্রবোধের কষ্ট যে আর দেখিতে পারিনা মা; দুধেরছেলে না খাইতে পাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে, আমি মা হইয়া কোন্‌ প্রাণে তাহা সহ্য করিব মা? মা! তুমি আমার বাছার দুঃখ দূর করিয়া দাও; আর আমি সহ্য করিতে পারি না।"

হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে উভয়ে অঞ্জলি পূরিয়া গঙ্গাজল লইয়া পান করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। এ দিকে গতরাত্রে প্রবোধের আহার হয় নাই; সে তীরে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়াই মার নিকট খাবার চাহিল। ভুবনমোহিনী তাহার কি উত্তর দিবেন? চক্ষের জল মুছিয়া পুত্রকে কহিলেন,—"সঙ্গে যে কিছুই নেই বাবা, কি খেতে দিব? চল দেখি সহরের মধ্যে যাই, যদি কোন অতিথিশালার সন্ধান পাই।" কিন্তু প্রবোধ কিছুতেই বুঝিল না, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক বৃদ্ধব্রাহ্মণ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া সেই স্থান দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তিনি বালককে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা হরিপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, এ ছেলেটী কেন কাঁদিতেছে?" হরিপ্রিয়া নিজেদের দুরবস্থার কথা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিবৃত করিলেন। সহৃদয় ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন, এবং সাতিশয় মিষ্ট বচনে কহিলেন, "মা! আপনারা আজি অনুগ্রহ করিয়া এ গরীবের গৃহে পদধূলি প্রদান করুন; গরীবের যে শাকান্ন জুটিবে, তাহারই দ্বারা আপনাদের আতিথ্য সৎকার করিয়া ধন্য হইব।" ব্রাহ্মণের এই মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট হইয়া তখন তিনজনে তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার অনতিদূরস্থ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে আপনার অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ইঁহাদিগের থাকিবার জন্য একটী পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং মহাসমাদরে ইঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিলেন। দুইদিন ইঁহার গৃহে মহাসমাদরে অবস্থান করিয়া বৃদ্ধা কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে ব্রাহ্মণ প্রবোধের হস্তে দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া সকলকে গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া পরে আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বীরেশ্বর মাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহার গৃহপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদ্যান অতি সামান্য; কতকগুলি রজনীগন্ধা, বেল, গোলাপ, কামিনী এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটী পাতাবাহারের গাছ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য অন্য কোন পুষ্পবৃক্ষ ছিল না। তবে উহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে একটী মার্ব্বল প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুন্দর ফোয়ারা ছিল, এবং নিশিদিন সুবাসিত সলিলরাশি সেই উৎসমুখে বিকীর্ণ হইত। বীরেশ্বর তাঁহার অধীনস্থ হতভাগ্য কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে মাসে মাসে যে বিপুল অর্থরাশি শোষণ করিতেছিলেন, তাহারই দ্বারায় আপনার এই বিলাসকুঞ্জটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ফোয়ারার পার্শ্বেই একটী বেদী, এবং তাহারই উপর একখানি আসন রক্ষিত ছিল; বীরেশ্বর আপনার প্রণাধিকা পত্নী প্রমীলাসুন্দরীর সহিত আসিয়া প্রত্যহ এই স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন।

যখন বীরেশ্বর উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুক্লা সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র মধ্যাকাশে বসিয়া রজত কিরণ ধারায় বিশাল প্রকৃতি হৃদয়ে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছিলেন। মাথার উপরে আকাশের গায়ে দুই একখণ্ড শুভ্র মেঘ চন্দ্রকরোজ্জ্বল অম্বর পথে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। অদূরবর্ত্তী রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে সহস্রাধিক শত রজনীগন্ধাস্তবকের মৃদুগন্ধ সুশীতল নৈশ সমীরণে ভাসিয়া

ভাসিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল করিতেছিল। উদ্যানের অনতিদূরে বকুল-বৃক্ষের ঘন বিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পল্লবরাশির মধ্যে আপনার মসী-কৃষ্ণকান্তি দেহখানি লুকাইয়া একটা পিক পঞ্চমস্বরে কুহুধ্বনি করিতেছিল; এবং তাহারই চতুর্দ্দিকে লতাগুল্মের অন্তরালবর্ত্তী ঝিল্লী সমূহের অশ্রান্ত ধ্বনি নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমনই সময়ে বীরেশ্বর ঈষৎ চিন্তাকুল মনে ধীরে ধীরে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বীরেশ্বর আসনের উপর উপবেশন করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী প্রমীলাসুন্দরী আপনার রক্তকুসুম কান্তি মধুর অধরে মধুরহাসি হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং আসিয়াই বীরেশ্বরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাদরে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"আজ আবার তোমায় এত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন? তুমি দিন রাত্রি কি এত ভাব?"

বীরেশ্বর আপনার মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, যেন তিনি কিছুই ভাবিতেছিলেন না এমনই ভাব দেখাইয়া কহিলেন,—"কই ভাবি আর কৈ?"

প্রমীলা। তুমি আমার কাছে নিশ্চয়ই গোপন করিতেছ। কিন্তু গোপন করিলেও আমি তোমার মুখের ভাব দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারি। কাল রাত্রিতে তুমি অতীন বাবুর বাসায় নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার সময় বলিয়া গেলে যে, রাত্রি নয়টার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিবে; আমি সমস্ত রাত্রি তোমার প্রতীক্ষা করিয়া জাগিয়া রহিলাম; অথচ

তুমি সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যুষে মহা অপরাধীর ন্যায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। এ সকলেরই বা অর্থ কি ?

বী। দেখ প্রমীলা, তোমার কাছে লুকাইয়া কোন লাভ নাই। সত্যই আমি তোমার নিকট ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। আমার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এ অধঃপতনের গতি বুঝি কাহারও রুদ্ধ করিবার শক্তি নাই।

প্রমীলার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাঁহারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু বাহিরে তিনি কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া কহিলেন,— "দেখ, কি হইয়াছে তুমি সমস্ত কথা আমার নিকট খুলিয়া বল; আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।"

বী। দেখ প্রমীলা, তোমার কাছে গোপন করিয়া কোন ফল নাই; কিন্তু আমার এ অধঃপতনের গতি যে কেহ রুদ্ধ করিবে, এরূপ আশাও নাই। গতকল্য জুয়ার খেলায় পাঁচ হাজার টাকা হারিয়াছি; তাহা ছাড়া অরীন বাবুর উদ্যানে যে নর্ত্তকী সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল, তাহার নিকট আমি আমার হৃদয় বিক্রীত করিয়া আসিয়াছি।

প্র। আমি মিথ্যা অনুমান করি নাই; সত্যই আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। দেখ, আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি, আর তুমি ওসব অসৎ সঙ্গে মিশিও না। তুমি আমাকে যাহাই করিতে বল, আমি তাহাতেই রাজী আছি; নাচিতে বল নাচিব, গাহিতে বল গাহিব; যাহা করিলে তুমি সন্তুষ্ট থাক তাহাই আমি করিব। কিন্তু তুমি আর অসৎসঙ্গে মিশিও না—নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিও না।

বী। দেখ প্রমীলা! অন্যকে উপদেশ দেওয়া বড় সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা বড় কঠিন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে প্রাক্তনের গতি

নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ; সুতরাং যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই। কাহার সাধ্য তাহা রোধ করিতে পারে ?

দুইজনের কেহই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না, উভয়েই বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে যে সময়ে হরিপ্রিয়া কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া রেল-গাড়িতে আরোহণ করিলেন, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সহসা প্রকৃতি অসংযত মূর্ত্তি ধারণ করিল। কোথাও কিছু ছিল না, চারিদিক পরিষ্কার; অকস্মাৎ পশ্চিম গগনোপান্তে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমস্ত পশ্চিম গগন ছাইয়া ফেলিল। ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ এক একবার পুঞ্জীভূত হইতেছে, আবার তখনই তাহা উদ্দাম বায়ু প্রবাহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; যেন সর্ব্বসংহারিণী প্রকৃতির মুক্তকেশপাশের ন্যায় তাহা অনন্ত অম্বরতলে উড্ডীয়মান। আর দূরে মেঘের গায়ে বিদ্যুতের কি দিগন্তব্যাপী লোলজিহ্বা! দেখিতে দেখিতে তুমুল ঝটিকা আসিয়া চরাচর বিক্ষুব্ধ করিল—শান্তস্থির ধরণীবক্ষে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলিতে লাগিল। ক্রমে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল; প্রলয়ের বারিধারার ন্যায় মুষলধারে অশ্রান্ত বেগে বৃষ্টিধারা ঝরিতে লাগিল। সে ঝড়বৃষ্টির শান্তি নাই—বিরাম নাই।

কিন্তু এরূপ ভীষণ দৈবদুর্য্যোগেও রেলওয়ে ট্রেণের গতির কিছুমাত্র বিরাম ছিল না। এই ভয়ানক সময়ে—এই ভীষণ দৈবদুর্য্যোগ মস্তকে বহন করিয়া যখন ট্রেণখানি সিমুলতলা ও বৈদ্যনাথের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথে পূর্ণবেগে প্রধাবিত হইতেছিল, সেই সময়ে রেলপুলিশের জনৈক ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর স্ত্রীলোকদিগের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। উক্ত

কক্ষমধ্যে তখন হরিপ্রিয়া, ভুবনমোহিনী এবং বালক প্রবোধ ছাড়া অপর কেহই ছিল না। অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে জনৈক অপরিচিত ফিরিঙ্গিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভুবনমোহিনীর বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল; তিনি সহসা আত্মরক্ষার্থ কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। এ দিকে ফিরিঙ্গিটা হাসিতে হাসিতে ভুবনমোহিনীর সম্মুখস্থ বেঞ্চে যাইয়া উপবেশন করিল। ভুবনমোহিনী আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া একমনে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণের নাম স্মরণ করিতেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন তড়িৎস্রোত বহিয়া গেল—তিনি দেহে নবশক্তি লাভ করিলেন। ভুবনমোহিনী আর কালবিলম্ব না করিয়া; দুর্গা, তারা, কালী সমস্ত দেবতাকে মনে মনে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া, শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বারা ফিরিঙ্গির উদরে বিষম পদাঘাত করিলেন। রমণীর বামপদের লাথিতে কি শক্তি আছে জানি না, কিন্তু পাষণ্ড ফিরিঙ্গি কোমলাঙ্গী রমণীর এই বামপদের লাথিও সহ্য করিতে পারিল না; সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া গাড়ীর মেজের উপরে পড়িয়া গেল। ভুবনমোহিনী এই অবসরে, আপনার অমূল্যধন সতীত্ব রক্ষার আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, জীবনের মায়া এককালীন পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সেই দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের জানালা দিয়া নীচে লম্ফ প্রদান করিলেন।

এ দিকে ফিরিঙ্গি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল, এবং উঠিয়াই ভুবনমোহিনীকে সম্মুখে না পাইরা বৃদ্ধা হরিপ্রিয়া ও বালক প্রবোধের উপর আপনার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। নরাধমের শরীরে দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিল কিনা জানি না; কিন্তু সে যে ঘৃণিত নারকীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল—যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতার

অভিনয় করিল তাহাতে তাহাকে মানবশ্রেণীর অন্তর্গত না করিয়া পশুশ্রেণীতে অভিহিত করিলে আমরা ভ্রান্ত হইব না। নরাধম ক্রোধান্ধ হইয়া, বৃদ্ধা হরিপ্রিয়া ও বালক প্রবোধকে একে একে সেই দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট হইতে বহু নিম্নস্থিত উপলবন্ধুর কঠিন ভূমিতে সবেগে নিক্ষেপ করিল; তারপর ট্রেণখানি বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকদিগের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুণ্যধাম দেওঘরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র সাঁওতাল পল্লীতে মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক ধার্ম্মিক ও সদাশয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার পিতামহদেব উপর্য্যুপরি কয়েকটী পুত্রের অকালমৃত্যুতে শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া, স্ত্রী ও একমাত্র শিশুসন্তান সহ শান্তিলাভের আশায় হিন্দুস্থানের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে পুণ্যক্ষেত্র বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; এবং বৈদ্যনাথের উপকণ্ঠস্থিত এই সুন্দর সাঁওতাল পল্লীটি তাঁহার ন্যায় সংসার বিরাগী শান্তিকামী লোকের পক্ষে বাসের একান্ত উপযুক্ত মনে করিয়া সেই স্থানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ইঁহারা বংশানুক্রমে এই স্থানেই বাস করিয়া আসিতেছেন।

বৈদ্যনাথের সুপ্রসিদ্ধ তপোবন পাহাড় ইহার অনতিদূরে অবস্থিত বলিয়া মহেশ্বর তাঁহার এই পল্লীর নামও তপোবন রাখিয়াছেন। বাস্তবিক গ্রামের নামও যেরূপ তপোবন, কার্য্যেও উহা ঠিক তপোবনেরই অনুরূপ। পল্লীস্থ সমুদয় সাঁওতালগণ আবালবৃদ্ধবণিতা নির্ব্বিশেষে মহেশ্বরের অতুলনীয় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিত। তিনিও পুত্রকন্যার ন্যায় তাহাদিগকে বিপদে আপদে সাহায্য করিতেন। ক্ষুধিতকে অন্নদান করিয়া, পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়া, দরিদ্রকে অর্থদান করিয়া তিনি সরল হৃদয় সাঁওতালগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্রে দরিদ্র সাঁওতালগণ দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া

অহঃরহঃ পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের এই পরম দয়ালু অন্নদাতা পিতার দীর্ঘজীবন কামনা করিত। মহেশ্বর চতুর্দ্দিকস্থ বন হইতে বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া তাহাই সহরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন; ইহাতে তাঁহার অর্থাগমও প্রচুর পরিমাণে হইত, এবং এই অর্থের সমুদয়ই তিনি আপনার আশ্রিত সাঁওতালগণের হিতার্থে উৎসর্গ করিয়া নিজেও যারপর নাই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যহ প্রাতে পাঁচ ঘটিকা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত দরিদ্র সাঁওতালগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহ বিতরণ করিতেন। বহুদূর হইতে সাঁওতালগণ আসিয়া পীড়ার সময় তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও পথ্য লইয়া যাইত; এবং তাঁহার এই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক ভাব, এবং দরিদ্র বৎসলতা প্রভৃতি অমূল্য গুণরাজি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সে প্রদেশের সমুদয় অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে তপোবনের ঋষি ঠাকুর বলিয়া অভিহিত করিত।

মহেশ্বরের একটী মাত্র কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। বহুকাল নিঃসন্তান অবস্থায় থাকিয়া ৺বৈদ্যনাথ দেবের পূজা অর্চনার পর বৃদ্ধ বয়সে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কন্যা সন্তানটী লাভ করায় তাঁহার আঁধার গৃহ আলোকিত হইয়াছে; বিশেষ তাঁহার পত্নী সুমিত্রার আর আনন্দের অবধি নাই। কন্যার বর্ণ প্রস্ফুটিত হেমকুসুমের ন্যায় বলিয়া সুমিত্রা তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'হেমপ্রভা'; হেমপ্রভার বয়স এক্ষণে চারি বৎসর হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ভুবনমোহিনী, হরিপ্রিয়া ও বালক প্রবোধ এই তিন জনেরই পতনজনিত আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে সেই দ্রুতগামী রেলগাড়ী হইতে পতনমাত্র তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। এমনই ভাবে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি তাঁহারা রেলপথের পার্শ্বে সেই পার্ব্বত্য-ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। প্রত্যুষে যখন সাঁওতালেরা সেই পথ দিয়া কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত আপনাদের ক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে দূরে দুইটী স্ত্রীলোক ও একটী বালককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইল। দরিদ্র সাঁওতাল-দিগের হৃদয় স্বভাবতঃই দয়ার আধার; তাহারা সংজ্ঞাহীন দেহ কয়েকটী তুলিয়া আপনাদের গৃহে লইয়া গেল; এবং বন্য লতাপাতা আনিয়া তাহারই রস সর্ব্বাঙ্গে মালিস ও অন্য নানাপ্রকার শুশ্রূষায় শীঘ্রই তাহা-দিগের মধ্যে দুই জনের—বৃদ্ধা হরিপ্রিয়া ও বালক প্রবোধের চৈতন্য সম্পাদন করিল। কিন্তু ভুবনমোহিনীর আঘাত এতই সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, সাঁওতালদিগের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না। এমনই অবস্থায় সাঁওতালেরা তিনজনকে দোলায় করিয়া বহন করতঃ তপোবনের ঋষির আশ্রমে লইয়া গেল। আশ্রমস্থ লোকজন তৎক্ষণাৎ বলকারক পথ্য সেবন করাইয়া হরিপ্রিয়া ও প্রবোধের বলশূন্য দেহে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিল; এবং মূর্চ্ছিতা ভুবনমোহিনীর মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য বিবিধ উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিল।

যখন ভুবনমোহিনী সংজ্ঞালাভ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে তিনি একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে একখানি পালঙ্কের উপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকের পার্শ্বে মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী জনৈকা বঙ্গনারী মলিনমুখে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন; এবং গৃহের এক প্রান্তস্থিত একটী ক্ষুদ্র দীপাধার হইতে ম্লান আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। ভুবনমোহিনীকে সংজ্ঞালাভ করিতে দেখিয়া শুশ্রূষাকারিণীর মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ভুবনমোহিনী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; শুশ্রূষাকারিণীও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাত্রস্থ ঔষধ লইয়া ভুবনমোহিনীর শরীরে প্রয়োগ করিতে এবং অধিকতর ক্ষিপ্রতা সহকারে রোগিণীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এমনই ভাবে আবার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল; বহুক্ষণের পর ভুবনমোহিনী আবার চক্ষু চাহিলেন, এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতি ক্ষীণস্বরে পার্শ্ববর্ত্তী শুশ্রূষাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, আমি এক্ষণে কোথায়?" পার্শ্বের মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী উত্তর করিলেন,—"মা, আপনি এখনও বড় দুর্ব্বল, এক্ষণে কথা কহিবেন না।" ভুবনমোহিনীর মনে পূর্ব্বস্মৃতি অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল, কিন্তু সকল কথা মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মা?" বলিতে বলিতে আবার তাঁহার চক্ষু মুদিত হইল; আবার শুশ্রূষাকারিণী পাত্রস্থ ঔষধ লইয়া তাঁহাকে সেবন করাইলেন, এবং ত্বরিতহস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

এমনইভাবে আবার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল; বহুক্ষণের পর আবার ভুবনমোহিনী ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এক্ষণে কোথায় মা?

আমার মা ও ছেলের কি হইয়াছে।" বীণানিন্দিত মধুরস্বরে পার্শ্বের করুণারূপিণী মাতৃমূর্ত্তি রোগিণীকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া রোগিণীর মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল; তিনি তাঁহার পুত্রকে দেখিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুশ্রূষাকারিণী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে এক্ষণে তাহার সহিত দেখা করিলে অত্যধিক আনন্দে আবার তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং আপাততঃ তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। শুনিয়া রোগিণী ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং সেজন্য আর বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

এমনইভাবে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইলে ভুবনমোহিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন। তাহার পর সুমিত্রা মা ও পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। তখন তিনজনে গলাগলি করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিলেন। তারপর মাতা ও কন্যা আশ্রমস্বামিনী সুমিত্রার নিকট তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি পীড়ার সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া যেভাবে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; সর্ব্বোপরি সাক্ষাৎ করুণারূপিণীর ন্যায় যেভাবে তিনি কত বিনিদ্র রজনী ভুবনমোহিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তাহার জন্য আজীবন তাঁহার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

সুমিত্রার ঐকান্তিক আগ্রহে হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী আরও প্রায় একসপ্তাহকাল তপোবনের শান্তিপূর্ণ পুণ্যাশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। এদিকে সুমিত্রা জেদ ধরিয়া বসিলেন যে প্রবোধকে তাঁহার নিজের কাছে রাখিয়া তাহার পড়াশুনার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার উদার হৃদয় ও সপ্রেম ব্যবহারে হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী এতই মুগ্ধ

হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সাহ্লাদে সুমিত্রার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কয়দিন পরে আশ্রমের লোকজন যাইয়া হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনীকে তাঁহাদের স্বগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল; এবং প্রবোধ সুমিত্রার মাতৃতুল্য স্নেহ ও যত্নে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই নিকটে অবস্থান করতঃ যথারীতি বিদ্যাশিক্ষাদি করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তপোবন পাহাড়ের পাদদেশে একখানি ক্ষুদ্র সাঁওতাল কুটীরের বহির্দ্দেশে বসিয়া দুইটী বালকবালিকা বাল্যের খেলাধূলায় মগ্ন রহিয়াছে। অদূরে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী তপোবন আকাশের গায়ে মাথাতুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার অভ্রভেদী শৃঙ্গসমূহ অস্তগামী সূর্য্যকিরণে সুবর্ণের ন্যায়, ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে; বোধ হইতেছে, যেন কোন যাদুকরের কুহকদণ্ড স্পর্শে হঠাৎ পাষাণময় তপোবন মনোহর সুবর্ণ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। একমাত্র দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষলতা কাঁপিতেছে, বনজঙ্গল আন্দোলিত হইতেছে; পরক্ষণেই দেখাগেল সেদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুবর্ণ পর্ব্বতের গায়ে সুবর্ণনির্ম্মিত বৃক্ষলতা ধীর স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতবর্ণ কিরণসমূহ তাহার গায়ে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। বালক বালিকা একদৃষ্টে এই পর্ব্বতের চূড়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপনাদিগের মধ্যে কথোপকথন করিতেছে। এই বালক প্রবোধ, আর বালিকা 'হেমপ্রভা'।

পাহাড়ের গায়ে একটী স্থলপদ্মের বৃক্ষ ছিল, তাহাতে অগণ্য স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া চিরশোভার আধার তপোবনের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। হেমপ্রভা প্রবোধকে সেই স্থলপদ্মের বৃক্ষটী দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"দাদা! তুমি এখান হইতে আমায় ফুল পাড়িয়া আনিয়া দিতে পার?"

প্রবোধ বলিল, ওখানে কি মানুষে উঠিতে পারে বোন্? কিন্তু ঐ গাছের উপরে যে পাখীটী বসিয়া আছে, তুই যদি বলিস, তবে এখনই আমি ওটাকে তীর মারিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি।

হেম। না দাদা, পাখীকে কি মারিতে আছে? পাখীকে মারিলে ওর মা বড় কাঁদিবে। আচ্ছা দাদা, বল দেখি, স্থলপদ্মের গাছে কতগুলি ফুল ফুটিয়া আছে?

প্রভার কথা শেষ হইতে না হইতেই উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, কয়েকটী হরিণশিশু অদূরে চঞ্চলচরণে ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিবামাত্রই প্রবোধ আর বাক্যব্যয় না করিয়া তীরের মত ছুটিয়া গেল, এবং সুকৌশলে একটী হরিণশিশুকে অতিশয় ক্ষিপ্রতা-সহকারে ধরিয়া ফেলিয়া আপনার উত্তরীয় দ্বারা তাহার গলদেশ বন্ধন করিল ও প্রভার নিকটে লইয়া আসিয়া বলিল, "দেখ প্রভা, কেমন সুন্দর হরিণ শিশু!" প্রভা কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র আনন্দিত না হইয়া বলিল,—"ওকে কেন ধরলে দাদা, দেখ্‌তে পাচ্ছনা, ও এখনও মা'র দুধ ছাড়েনি। ওকে ছেড়ে দাও; একটু পরেই ওর যখন দুধের অম্বল উঠ্‌বে, ও তখন খাবার জন্য এত টানাটানি করবে যে হয়ত দড়ির ফাঁস লেগেই মরে যাবে।" প্রবোধ কিন্তু প্রভার কথায় সম্মত হইল না; বলিল,—"না প্রভা, ছেড়ে দেব কেন? একে আমরা পুষ্‌বো। কেমন সুন্দর জিনিষ হবে। তুই একে ভাল বাস্‌বি তো?" প্রভা মুখখানি অতিশয় ভারি করিয়া বলিল,—"তুমি যদি ওকে ছেড়ে না দাও, তাহলে আমি এখনই গিয়া মাকে বলিয়া দিব।" প্রবোধও চড়াস্বরে বলিল,—যানা মাকে বলেছে। তুই যে বিড়াল ছানা পুষেছিস্?" প্রভা তখন রাগে গর্‌গর্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া প্রবোধ হরিণশিশুকে ছাড়িয়া

দিয়া যাইয়া প্রভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "রাগ কোরোনা বোনটী, আমি তোমায় ঐ গাছ হইতে ফুল আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া প্রবোধ একটী ক্ষুদ্র টিলার উপরে আরোহণ করিয়া রাশিকৃত বন্যফুল চয়ন করিয়া আনিয়া প্রভার মস্তকে ও কবরীতে পরাইয়া দিল। প্রভা ফুল পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল,—"দাদা তুমি রোজ রোজ আমায় ফুল তুলে দেবে?" প্রবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কেন দেব না বোন্? রোজ আমি তোমায় ফুল এনে দিব।"

এমনই ভাবে দুইজনে নিত্য নিত্য কত খেলাই খেলিত। প্রবোধ প্রত্যহই হেমকে ফুল পাড়িয়া দিত; হেম কতকবা তাহার নিজের কবরীতে পরিত, কতকবা তাহার পুতুলের গায়ে পরাইত; কখন কখন বা মালা গাঁথিয়া তাহা প্রবোধের গলায় পরাইয়া দিত।

একদিন হেম বলিল "দাদা! আজ এক নূতন খেলা খেলিবে?"

প্রবোধ আগ্রহভরে বলিল কি খেলা প্রভা?

প্রভা বলিল,—"তুমি আমার বর হও, আর আমি তোমার বউ হইতেছি; যেন আজ আমাদের বিয়ে।" তখন দুইজনে বরবধূ সাজিয়া খেলাধূলা করিতে লাগিল। দূর হইতে সুমিত্রা এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার দুইচক্ষু আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি মহেশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়া মহা আহ্লাদভরে বালক বালিকার এই অপূর্ব্ব মিলন দৃশ্য দেখাইয়া দিলেন; তারপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের সেই অপূর্ব্ব খেলাধূলা দেখিতে লাগিলেন। সেই খেলাধূলা দেখিতে দেখিতে সুমিত্রা ও মহেশ্বর পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন যে প্রবোধ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত তাঁহারা তাঁহাদের বড় স্নেহের হেমপ্রভার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এমনই ভাবে দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ আট বৎসর অতীত হইয়া গেল। প্রবোধ এই আট বৎসরকাল তপোবনের আশ্রমে থাকিয়া যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার এই সাফল্য লাভে সুমিত্রার আর আনন্দ ধরিতেছে না; তিনি এই উপলক্ষে মহাধুমধামে গৃহদেবতা 'সর্ব্বমঙ্গলা' মাতার ভোগ দিয়াছেন, এবং সেই প্রসাদরাশি দ্বারা বহুসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়া অপার তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। প্রবোধকে এক্ষণে আই, এ, পড়িবার জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে, তাই সুমিত্রা মহেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে প্রবোধের তপোবন ত্যাগের পূর্ব্বেই হেমপ্রভার সহিত তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হউক। কিন্তু মহেশ্বর তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন "এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া আমি কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে করি না; বিশেষতঃ যখন আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন নাই, তখন কচি কচি ছেলে মেয়েকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা যে সমাজের উপর কতবড় অত্যাচার, তা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।" সুমিত্রাও স্বামীর কথার যুক্তিবত্তা সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহারই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে প্রবোধ আই, এ, পড়িবার জন্য বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসে

মাসে কুড়িটাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছিল; মহেশ্বরও তাহাকে প্রতিমাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু এই পঁচিশ টাকার মধ্যে নিজের খরচের জন্য কেবলমাত্র দশটী টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট পনর টাকা সে বাটীতে মার নিকট পাঠাইয়া দিত। মহেশ্বর ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ভুবনমোহিনীর নামে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু বড় কষ্টে তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইলেও ভুবনমোহিনী তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই; প্রতিবারেই মহেশ্বরের প্রেরিত টাকা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। তাই বড় দুঃখে ও বড় কষ্টে এই সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাই মা ও দিদিমার এই দুঃখ দূর করণার্থে প্রবোধ প্রথম মাসে বৃত্তির টাকা পাইয়াই নিজের জন্য মাত্র পাঁচটি টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা মার নিকট পাঠাইয়া দিল, এবং ইহার পর প্রতি মাসে নিজের খরচের জন্য দশটি মাত্র টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা যথাসময়ে বাটিতে পাঠাইয়া দিত। যখন মহেশ্বর এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার ভাবী জামাতার ছাত্রজীবনের এই মিতব্যয়িতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং অসাধারণ মাতৃভক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্লাঘায় যারপর নাই অভিভূত হইলেন, এবং তদবধি প্রবোধকে মাসিক পাঁচ টাকার পরিবর্ত্তে পনর টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবোধ পূর্ব্বেরই ন্যায় নিজের জন্য কেবল দশটি টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট পঁচিশ টাকা জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিল। যখন মহেশ্বর পুনরায় এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাহার পূর্ব্বের সেই শ্লাঘা ও বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; তিনি দেবতার চরণে তাঁহার ভাবী জামাতার অহরহঃ মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রবোধ আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভাগুণে বহরমপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তাহার অধ্যাপকগণ তাহার ব্যবহারে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহাকে ঠিক পুত্রের ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। ইঁহাদেরই মধ্যে জনৈক সাহিত্যসেবী অধ্যাপকের উপদেশে প্রবোধ মাতৃভাষার সেবায় দীক্ষিত হয়, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠে। উক্ত সাহিত্যসেবী অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার ছাত্রশিষ্যের কবিতাগুলি লইয়া সাগ্রহে আপনার দেশবিখ্যাত মাসিকে পত্রস্থ করিতেন; এবং তাঁহার নিকটে এইরূপে উৎসাহিত হইয়া এই নবীন সাহিত্যসেবী বালক দুই বৎসরের মধ্যেই বঙ্গের কাব্যজগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। এই সময়ে প্রবোধের একটী কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গের জনৈক প্রথিতনামা সম্পাদক তাহাকে এরূপ শ্রদ্ধার মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন যে, এত অল্পবয়সে আর কোনও নবীন কবিকে এতটা সম্মান লাভ করিতে দেখা যায় নাই।

দুই বৎসর অন্তে প্রবোধ বহরমপুর কলেজ হইতে যথাসময়ে আই, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করতঃ মাসিক চল্লিশ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইল। তাহার এই অসাধারণ সাফল্য লাভে সুমিত্রা আবার মহা ধূমধাম সহকারে "সর্ব্বমঙ্গলা" মাতার ভোগরাগ প্রদান করিলেন, এবং তদুপলক্ষে আবার বহুসংখ্যক দরিদ্র নারায়ণ ও বিদ্যার্থীকে মহা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। প্রবোধ এই সময়ে মাতৃচরণ দর্শনার্থে জন্মভূমি কুমারডাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়াছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবামাত্র মহেশ্বর তাহাকে লিখিলেন যে, তিনি তাহাকে এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী

কলেজে পড়াইতে চাহেন ; কিন্তু প্রবোধ তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া অতিশয় বিনীতভাবে লিখিল ;—"বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে আপনার আদেশ পালনে আমি সক্ষম হইব না, সেজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতা মহানগরী ছাত্রজীবনে বাসের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। কলিকাতায় যাইয়া অনেক প্রতিভাশালী ছাত্রেরও পদস্খলন হইতে দেখা গিয়াছে। তারপর যাহারা পল্লীগ্রামের মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে যক্ষ্মাবীজাণুপূর্ণ পূতিগন্ধময় কলিকাতা নগরী যে সাক্ষাৎ নরকেরই তুল্য তাহাতে সন্দেহ কি? ওই যে কলিকাতার মৃত্তিকাগর্ভে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অগণ্য বিষ্ঠা নদী প্রবাহিত, ওগুলি কতখানি বিষ প্রত্যহ উদ্গীর্ণ করিয়া থাকে, কেহ তাহার সঠিক সংবাদ রাখেন কি? আর ওই যে কলিকাতার গৃহে গৃহে রন্ধনশালার অনতিদূরে পায়খানাগুলি অবস্থিত, ওগুলি কি পরিমাণে বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন কি? পল্লীর উন্মুক্ত বক্ষে চিরকাল বাস করিয়া হঠাৎ এই নরককুণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়া যে আমার পক্ষে কতদূর যন্ত্রণা দায়ক, অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর আমার বহরমপুরের পরম পূজ্যপাদ অধ্যাপক মণ্ডলীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিতেও আমি সম্যক অসমর্থ ; তাই বহরমপুরেই আমার বি, এ পড়িবার ইচ্ছা। সুতরাং আপনি আমাকে কলিকাতা যাইতে আদেশ করিবেন না, শ্রীচরণে ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।" প্রবোধের এই পত্র পাইয়া, তাহার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া মহেশ্বর তাহারই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং সাহ্লাদে তাহাকে বহরমপুরেই বি, এ পড়িবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রবোধের আই, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই সুমিত্রা আবার মহেশ্বরকে বলিলেন যে হেমপ্রভা ও প্রবোধের শুভোদ্বাহ এক্ষণে সম্পন্ন করিতে হইবে। মহেশ্বরও পূর্ব্বে এবিষয়ে সুমিত্রার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি স্বয়ংই হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনীর সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য কুমারডাঙ্গা গ্রামে গমন করিলেন। যখন মহেশ্বর আসিয়া তাঁহার পরম স্নেহের হেমপ্রভাকে প্রবোধের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন, তখন হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী সাহ্লাদে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তবে ভুবনমোহিনী একবাক্যে বলিলেন যে, হাজার হউক না কেন তথাপি বীরেশ্বরই প্রবোধের সর্ব্বপ্রধান অভিভাবক; সুতরাং তাঁহার মত না লইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহারা পাকাপাকি কিছুই স্থির করিতে পারেন না। ভুবনমোহিনীর এই কথা সকলেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেন; এবং অবিলম্বে হরিপ্রিয়া সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া বীরেশ্বরের মতামত চাহিয়া তাঁহার নিকটে পত্র লিখিলেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিককাল অতীত হইয়া গেলেও বীরেশ্বরের নিকট হইতে এই পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। দীর্ঘকালেও যখন প্রথম পত্রের কোন উত্তর আসিল না, তখন তাঁহারা বীরেশ্বরকে আবার একখানি পত্র লিখিলেন; কিন্তু যখন যথোচিত সময়ের মধ্যে এ পত্রেরও কোন উত্তর আসিল না, তখন তাঁহারা বীরেশ্বরের মতামতের জন্য আর অপেক্ষা করা

সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না; অবিলম্বে হেমপ্রভার সহিত প্রবোধের শুভ বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে তপোবনের পুণ্যাশ্রমে হেমপ্রভা ও প্রবোধের শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। সুমিত্রা এই উপলক্ষে যথারীতি দেবার্চনা এবং অষ্টাহকাল ধরিয়া তপোবন প্রদেশের সমুদয় সাঁওতালগণকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও বস্ত্র এবং এক একখানি শ্রীশ্রীচণ্ডী বিতরণ করিলেন। স্বভাব দরিদ্র সাঁওতালগণ তাঁহার এই অসাধারণ দানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কায়মনোবাক্যে দেবতার চরণে নবদম্পতির দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিল। আর বর কন্যাকে তিনি যে যৌতুক প্রদান করিলেন, তাহার মধ্যে দুই একটী দ্রব্যের উল্লেখ করিবার প্রলোভন আমরা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'প্রভাকে' অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে তিনি একখানি কৃপাণ প্রদান করিলেন;—উদ্দেশ্য প্রভা যেন সতত উহা অঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখে। আর প্রবোধকে তিনি একটী স্বর্ণ শৃঙ্খল দান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বৎস, যতদিন আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন না হয়, ততদিন বংশ পরম্পরাক্রমে এই শৃঙ্খল অঙ্গে ধারণ করিবে।' দুঃখের বিষয় তিনি জামাতাকে কয়সেট্ চায়ের বাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক তালিকা আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

বিবাহের উৎসব যথারীতি সমাপ্ত হইলে প্রবোধ বহরমপুরে যাইয়া বি, এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হইল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

সেই বৎসর পূজার পূর্ব্বে মহেশ্বর তাঁহার নব জামাতাকে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে তপোবনে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন;

কিন্তু প্রবোধ তাহার শ্বশুরের এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না,—করা আবশ্যক মনে করিল না। প্রত্যুত্তরে সে তাহার শ্বশুরকে লিখিল,—"আপনি আমাকে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে তপোবনে যাইবার আদেশ করিয়াছেন। আপনার প্রত্যেক আদেশই আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ পালন করিতে বাধ্য হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব বলিয়া যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তপোবনে গমন করিলে আমার সে ব্রতে বিঘ্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আজকাল ছাত্রজীবনের এই মহৎ কর্ত্তব্যটী আমাদের সমাজ বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি। আমরা যে দিন দিন খর্ব্বকায়, রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইতেছি; ব্রহ্মচর্য্য পালনে অবহেলাই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? বর্ত্তমানে সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে একমাত্র আর্য্য সমাজ ভিন্ন অপর কেহ এবিষয়ে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখেন বলিয়া মনে হয় না। পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ের অনুকরণে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। তপোবনের পুণ্যাশ্রমে এইরূপ একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। আমার বড় ইচ্ছা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে এইরূপ একটী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করি, এবং এমনই ভাবে দেশের কার্য্যে এজীবন উৎসর্গ করি। আর বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ ঘোর দুরবস্থা হইয়াছে, বিশাল হিন্দুস্থানের সমস্ত ব্যক্তি যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে লোকশিক্ষাই এক্ষণে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হওয়া উচিত। আজকাল পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশ সংবাদপত্র এই লোকশিক্ষার প্রধান উপায়ে

পরিণত হইয়াছে; সুতরাং আমার প্রস্তাবিত তপোবনের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় হইতে দেশীয় ভাষায় একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রও বাহির করা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।"

প্রবোধের এই পত্র পাইয়া—তাহার ছাত্রজীবনের এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞান দেখিয়া মহেশ্বরের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মহা আহ্লাদভরে তখনই বাটীর মধ্যে গমন করিলেন; এবং তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীকে আহ্বান করিয়া প্রবোধের পত্রের আদ্যন্ত তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন। প্রবোধের এই পত্র শুনিয়া সুমিত্রার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইল; তিনি হর্ষগদ্গদস্বরে কহিলেন;—"সত্যই সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছিলেন; তাই এমন অমূল্যরত্নের সহিত আমার প্রভার বিবাহ দিতে পারিয়াছি। এমন উচ্চাঙ্গের কথা আমি আর কখন কাহারও নিকট শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাঁচিয়া থাকিলে আমার প্রবোধ যে জগতের মহাপুরুষদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমারও আন্তরিক ইচ্ছা এই যে সহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সরল হৃদয় সাঁওতালগণ কর্ত্তৃক অধ্যুসিত, তপোবনের এই শান্তিপূর্ণ পুণ্যাশ্রমে প্রবোধের প্রস্তাবিত একটী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।" মহেশ্বরও পত্নীর প্রত্যেক কথায় সায় দিয়া গেলেন। তারপর সেদিন হেমপ্রভা ও প্রবোধের মঙ্গলকামনায় শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলার চরণে সহস্র বিল্বপত্র উৎসর্গীকৃত হইল, এবং সমস্তদিন ধরিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদ সমূহ বিতরিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর হেমপ্রভা এই প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে; তাহার বিনম্র ও সলজ্জ ব্যবহারে গ্রামের সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। শ্বশুরগৃহে আসিবার কালে সুমিত্রা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছেন,—স্বামীই নারীজাতির অমূল্য রত্ন; এই রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিলে নারীজাতি সংসারে বরণীয়া হইতে পারে—অন্য কিছুতেই নহে। সর্ব্বদা স্বামীর সুখ সাধনে নিযুক্ত রহিবে। যোগ, তপ, জপ, পূজা, আরাধনা, স্ত্রীলোকের এ সকলের কিছুই কিছু নহে; স্বামীই তাহার একমাত্র দেবতা। সুতরাং স্বামীর মনে যাহাতে কখন কোন ক্লেশ না জন্মে, সর্ব্বদা সে বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা করিবে। শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ী এবং অন্যান্য গুরুজনকে সতত ভক্তি করিবে; কখনও তাহাদের অবাধ্য হইও না। মনে রাখিবে তাঁহারা তোমার গুরুর গুরু; সুতরাং তোমার মহাগুরু। সংসারের কাজকর্ম্ম যতদূর সম্ভব সমস্ত নিজেই করিতে চেষ্টা করিবে, অন্য কাহাকেও হাত দিতে দিবে না। জল তোলা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রাঁধা বাড়া, এ সকল স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ম্ম; ইহা করিতে কোন লজ্জা নাই—দোষ নাই; দাসী চাকর থাকিলেও তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া এ সকল কার্য্য করিবে। পরিশ্রম করিলে শরীর ক্ষয় হয় না, বরং ভাল থাকে; বিনা পরিশ্রমেই শরীর মরিচা ধরা অস্ত্রের ন্যায় দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই পরিশ্রমের অভাবে হিষ্টিরিয়া নামক একটী নূতন ব্যাধির সুত্রপাৎ হইয়াছে। আমাদের আজকালকার সভ্যতাভিমানিনী নবীনাগণ

সংসারের কাজকর্ম্ম সমস্তই দাসী চাকর ও পাচক বামুনের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা অহঃরহঃ কেবল নভেল লইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া সময় অতিবাহিত করেন; তাহারই ফলে ইহাদের মধ্যে নূতন নূতন ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বংশ বৃদ্ধি করা ভিন্ন সংসারে ইহাদের আর কোনও কর্ত্তব্য আছে বলিয়া ইহারা মনে করেনা; কিন্তু সেই বংশধরগণও তালপাতার সিপাহী অপেক্ষা অধম হইয়া পড়িতেছে। পরিশ্রমের অভাবই যে ইহার প্রধান কারণ, তাহা ইহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। দেখিও, যেন এ সকল দোষ কথন তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। আর রন্ধন কার্য্যই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; ইহারই জন্য নারীজাতি লক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী ও পুত্রকন্যা এবং আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে মনে যে একটা অসীম তৃপ্তি ও নিরাবিল আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, অন্য কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে। ইচ্ছা করিয়া এ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইও না। সর্ব্বদা শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ীর সুখ সাধনে রত রহিবে; দেখিও তোমার জন্য সংসারে যেন কথনও কোন অশান্তির সৃষ্টি না হয়।" হেমপ্রভা শ্বশুরগৃহে আসিয়া তাহার মাতৃদত্ত এই অমূল্য উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছে। নববধূ হইয়াও সে সংসারের যত কিছু কাজকর্ম্ম সকলই স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ভুবনমোহিনী বা হরিপ্রিয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে হেমপ্রভা তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজে সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং বলে;—"আমি থাকিতে আপনারা এ সব কাজে হাত দিবেন কেন; আপনারা এখন পূজা অর্চ্চা এবং বসিয়া বসিয়া কেবল গৃহিণীপণা করিবেন।" নববধূ হেমপ্রভার এই অতুলনীয় চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে তাহার

প্রশংসা করিতেছে। আজি কুমারডাঙ্গার সর্ব্বত্র কেবল হেমপ্রভার নাম; যেখানে যাইবে সেইখানেই শুনিতে পাইবে, সকলে মুক্তকণ্ঠে এই নববধূ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণবতী মাতার অজস্র প্রশংসায় গ্রাম প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বাস্তবিক এই সকল প্রশংসার মাল্য চন্দন যে হেমপ্রভা অপেক্ষা তাহার শিক্ষাদাত্রীরই অধিকতর প্রাপ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হেমপ্রভা শুধু সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়াই নিশ্চিন্ত নয়; তাহার শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সে সতত সচেষ্ট। প্রত্যহ প্রাতে ফুল তোলা, শিব গড়ান ও সজ নৈবেদ্য করা হেমপ্রভার নিত্য কর্ম্ম। তাহার আগমনাবধি হরিপ্রিয়ার দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ অশান্তির সংসারে শান্তিধারা প্রবাহিত হইয়াছে; বহুদিনের দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের জ্বালা বিস্মৃত হইয়া হেমপ্রভার কল্যাণে এতদিনে হরিপ্রিয়া ও ভুবনমোহিনী প্রকৃত সুখের আস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছেন!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকাল, মেঘহীন সুনীল আকাশ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ সুন্দর আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—রজত কিরণধারায় ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। এই সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে প্রমীলাসুন্দরী একাকিনী চিন্তাকুল মনে তাঁহাদের উদ্যানের মধ্যস্থ বেদিকার উপর বসিয়া আছেন;—একাকিনী, কেননা বীরেশ্বর সেখানে নাই। সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে, সেইশুভ্র কৌমুদী-বিধৌত বেদিকার উপর প্রমীলাসুন্দরী নিরব. নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে একাকিনী বসিয়া আছেন; যেন কে একখানি দেবী প্রতিমা বেদিকার উপর বসাইয়া গিয়াছেন,—প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, যেন শ্রাবণের গঙ্গা কুলে কুলে ভরা, রূপ আর ধরিতেছেনা; যেন সে শুভ্র জ্যোৎস্নাটুকুও সে রূপজ্যোতিতে পরিম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রমীলাসুন্দরী বিষণ্ণ মনে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন—কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন যে তাঁহার অদৃষ্টে এ দুঃখ এ যন্ত্রণা কেন? কেন বিধাতা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন; কেন তাঁহার জীবনের সবসাধ, সবসুখ অতৃপ্ত থাকিতে অকালে তাঁহার জীবন এমন বিষময় করিয়া দিলেন? আজি দীর্ঘ দশবৎসরকাল তিনি এমনই ভাবে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন; দশবৎসর হইল তিনি বীরেশ্বরের হৃদয়ভরা ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় বীরেশ্বরের আদরিণী ভার্য্যা নহেন, বরং এক্ষণে তিনি বীরেশ্বরের ঘোর চক্ষুশূল হইয়াছেন; সময়ে অসময়ে বীরেশ্বর অকারণে

তাঁহাকে উৎপীড়িতা করিয়া থাকেন ; অকারণে বীরেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে কঠিন শেল বিদ্ধ করিয়া থাকেন। যে বীরেশ্বর একদিন পত্নীর মানভঙ্গ করিতে যাইয়া তাঁহার পদদ্বয় পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলেন ; যে বীরেশ্বর একদিন তাঁহারই মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া আপনার গর্ভধারিণী মাতা ও স্নেহময়ী ভগ্নীকে গৃহ হইতে বিতাড়িতা করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই বীরেশ্বর আর এক্ষণে তাঁহার নহেন—তিনি এক্ষণে পরের হইয়াছেন। এই দীর্ঘ দশবৎসরকাল প্রমীলাসুন্দরী কেবল অহঃরহঃ পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন। বীরেশ্বর এক্ষণে আর একটী দিনের তরেও স্বগৃহে রাত্রিবাস করেন না ; আহারান্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যান ; এবং সমস্তরাত্রি প্রেমিকাভবনে যাপন করিয়া প্রভাতে টলিতে টলিতে গৃহে ফিরিয়া আসেন। এই দীর্ঘ দশবৎসরকাল ধরিয়া বীরেশ্বর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহার এই প্রেমিকার চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সে সমস্তই গিয়াছে ; এক্ষণে প্রমীলাসুন্দরীর গহণায় আসিয়া টান পড়িয়াছে। বেতনের টাকা পাইবামাত্র তাহা প্রেমিকাসুন্দরীর সিন্দুকজাত হয় ; তারপর বীরেশ্বর মদের টাকার জন্য প্রমীলার নিকট গহণা চাহিয়া বসেন ; না দিলে অশেষ যন্ত্রণা দেন, প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সংসারের সমস্ত খরচ এক্ষণে প্রমীলাসুন্দরীকেই চালাইতে হয়, বীরেশ্বর সংসারের খরচের জন্য এক কপর্দ্দকও বাহির করেন না। প্রমীলার মার হস্তে অনেক অর্থ সঞ্চিত ছিল ; তিনিই এতদিন ধরিয়া নিজ হইতে সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বীরেশ্বরের এই ঘোর অধঃপতন দেখিয়া, এবং এমনই ভাবে হাতের সমস্ত টাকা বীরেশ্বরের সংসারের জন্য খরচ করিলে পরিশেষে নিরাশ্রয়া হইয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে বুঝিতে পারিয়া, তিনি এক্ষণে কন্যা জামাতার

সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। এতদিন কেবলমাত্র মার মিষ্ট বচনে প্রমীলাসুন্দরী সকল দুঃখ সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু সেই মাও এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; তাই প্রমীলাসুন্দরীর হৃদয়বেদনা আজি অসহ্য হইয়াছে; অসহ্য হৃদয় বেদনায় তিনি একটু শান্তিলাভের আশায় উদ্যানমধ্যস্থ সেই কৌমুদী-বিধৌত বেদিকার উপর যাইয়া উপবেশন করিয়াছেন। আজি দীর্ঘ দশবৎসর পরে প্রমীলাসুন্দরী পুনরায় উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; যে হইতে তিনি বীরেশ্বরের হৃদয়ভরা ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন, সেই হইতে তাঁহার উদ্যান ভ্রমণও বন্ধ হইয়াছে। বীরেশ্বরের সেই পরম রমনীয় উদ্যান এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন সযত্নরক্ষিত নহে; উদ্যান মধ্যে অনেক আগাছা জন্মিয়া গিয়াছে, অনেক পুষ্পবৃক্ষ নষ্ট হইয়াছে; কর্ত্তার শাসন না থাকায় উদ্যানের শ্রীর প্রতি মালিরও আর তেমন দৃষ্টি নাই। এই শ্রীভ্রষ্ট উদ্যানের মধ্যে প্রমীলাসুন্দরী অনেকক্ষণ হইতে একাকিনী বসিয়া আছেন। বীরেশ্বর চলিয়া গেলে এতদিন তিনি মার নিকটে যাইয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন; কিন্তু আজি আর কাহার নিকটে যাইবেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন;—পারিলেন না; অতীতের নির্ম্মম স্মৃতি আসিয়া বুক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বহু চেষ্টাতেও কিছুতেই যখন নিদ্রা আসিল না, তখন প্রমীলাসুন্দরী শান্তি অন্বেষণে দীর্ঘ দশবৎসর পরে তাঁহার বড় সাধের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তাহাতেই কি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন?—পারিলেন না। হায় ভ্রান্ত নারী! বাহিক সুখরে দ্বারা কি মনের আগুণ নিবাইতে পার?

সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত উদ্যানে, সেই শুভ্র কৌমুদীবিধৌত বেদিকার উপর প্রমীলাসুন্দরী পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সমস্তরাত্রি বিনিদ্রভাবে অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু আসিয়া যখন তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিল, তখন তাঁহার ঈষৎ তন্দ্রা আসিল। তারপর যখন ঝীর আহ্বানে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে বালভানুর লোহিত কিরণজাল আসিয়া তাঁহার চিন্তা ক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রায় আট ঘটিকায় সময় বীরেশ্বর প্রেমিকাভবন হইতে রক্তচক্ষে টলিতে টলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে ফিরিয়াই প্রমীলার কক্ষে প্রবেশ করিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন,—"আমার এখনই একশ টাকার দরকার, তোমায় দিতে হবে।" প্রমীলা ভীতা হইয়া কহিলেন,—"আমি মেয়েমানুষ, টাকা কোথায় পাব?"

বী। টাকা না থাকে, গহনা দাও।

প্র। সব গহনা ত দিয়াছি, এখন আমার একমাত্র অনন্ত দুগাছি অবশিষ্ট আছে; ও দুগাছি গহনা আমি দিতে পারিব না।

বী। না দাও, আমি জোর ক'রে কেড়ে নিব।

প্র। নিজের স্ত্রীর গা হইতে জোর করিয়া গহনা কাড়িয়া লইবে, ইহা কি বড়ই পৌরুষের কথা?

বী। না হউক পৌরুষের কথা; কিন্তু টাকা না হইলে আজ আমার মান থাকিবে না। আজ আমাকে গার্ডেনপার্টি দিতে হবে; সব নিমন্ত্রণ করা হয়েগেছে; এখন যদি টাকার যোগাড় না হয়, সব মাটী হবে বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার মুখ থাকবে না।

প্রমীলাসুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তোমার কি কখন সুমতি হবে না? সংসার যে—" বীরেশ্বর বাধা দিয়া বলিলেন—"কাঁদো কেন?"

প্র। কাঁদি এইজন্য, সংসার যে ছারেখারে গেল।

বী। যায়, যাক্।

প্র। তোমার কি কথনও সুমতি হবে না?

বী। আমার কি কুমতি হয়েছে?

প্র। হা ভগবান, তাও কি তুমি বুঝ্‌তে পার না?

বী। দেখ, মেয়েমানুষের বড়াই আমার সহ্য হয় না। ভালয় ভালয় অনন্ত চুগাছা এখনই আমায় খুলে দাও; নইলে ভাল হবে না।

প্র। আমি আর তোমায় গহনা দিতে পার্‌ব না। সব উড়িয়ে দিলে; এখন যে একমুঠো ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হতে হবে।

বী। ফের বল্‌ছি, আমার কাছে জ্যাঠামি করিও না। এখন গহনা দেবে কিনা বল।

প্র। এখন গহনা নেবে, তারপর কালই যে রাস্তায় বেরুতে হবে?

বী। তা হয় হবে।

প্র। আমি তোমাকে গহনা দিতে পার্‌ব না।

বী। তোমার অদৃষ্টে আজ নিতান্তই মার খাওয়া লেখা আছে দেখিতেছি।

প্র। মারই, আর যাইকর, আমি স্ত্রী হয়ে তোমার পাপের প্রশ্রয় আর কিছুতেই দিতে পারব না।

বী। দেবেনা, তোমার বাবা দেবে।

এই বলিয়া বীরেশ্বর পৈশাচিক বলে সহসা প্রমীলাসুন্দরীর গলা টিপিয়া ধরিল; প্রমীলাসুন্দরী বীরেশ্বরের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কক্ষ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পশ্চাদ্দিক হইতে চৌকাট বাধিয়া যাওয়ায় সহসা মেজের উপর পড়িয়া গেলেন; পড়িয়া কপাটের কোণ লাগিয়া তাঁহার ললাটদেশ কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে বীরেশ্বর

তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনন্তগাছি বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইল; তারপর আপনার উন্মত্তক্রোধ সংবত করিতে না পারিয়া প্রমীলার উদরে বিষম পদাঘাত পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমীলা সেই কঠিন ইষ্টকময় গৃহতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটের আঘাত তেমন সাংঘাতিক না হইলেও বীরেশ্বর অকস্মাৎ তাঁহার উদরে যে বিষম পদাঘাত করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছিল। গৃহে তখন এমন কেহ ছিলনা যে তাঁহাকে একটু বাতাস করে, বা তুলিয়া বসায়। ইতিপূর্ব্বেই বাটীর দাসী চাকর প্রায় সকলে বেতন না পাওয়ায় চলিয়া গিয়াছিল। একমাত্র বুড়া ঝী পুরাতন মনীবের মমতা কাটাইতে না পারিয়া প্রমীলার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তখনও স্বীয় কার্য্যে অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু সেও তখন গৃহে ছিল না—কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা ছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিতে পাইল যে প্রমীলাসুন্দরী মেজের উপরে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; তাঁহার ললাট হইতে রক্তধারা নির্গত হইয়া দেহের বস্ত্র রুধিরে রঞ্জিত করিয়াছে। করুণ হৃদয়া বৃদ্ধা ঝী তাহার গৃহস্বামিনীর এই দুর্দ্দশা—এই ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখিয়া মর্ম্মের প্রত্যেক তন্ত্রীতে দারুণ বেদনা অনুভব করিল, এবং যত্ন ও ক্ষিপ্রতার সহিত প্রমীলার ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিয়া আপনার বসনাগ্রভাগ ছিন্ন করতঃ ক্ষতস্থানে পটী বাঁধিয়া দিয়া, উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমীলা উঠিলেন না—উঠিতে পারিলেন না। বাহিক যন্ত্রণার সহিত অন্তরের বিষম বেদনা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অতীতের নির্ম্মম স্মৃতি আসিয়া তাঁহার বিষম হৃদয়জ্বালা উপস্থিত করিল। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল; সেই কথা মনে হওয়ায় এক্ষণে তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিয়া করিয়া অবশেষে প্রমীলাসুন্দরী অনাহারেই সেই কঠিন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বৃদ্ধা পরিচারিকা এতক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এক্ষণে তাঁহাকে নিদ্রাভিভূতা হইতে দেখিয়া সেও একটু আশ্বস্ত হইল, এবং সুনিদ্রা হইলে দেহের সমস্ত ক্লেশ দূর হইবে মনে করিয়া তাঁহার নিদ্রায় কোনরূপ বিঘ্নোৎপাদন না করিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমীলাসুন্দরী নিদ্রিতাবস্থাতেও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না—দারুণ দুঃস্বপ্ন আসিয়া তাঁহার সুনিদ্রার অরি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন যমদূতের ন্যায় ভীষণাকৃতি দুইটা বিকটাকার মনুষ্য তাঁহার পদে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে টানিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া গেল; তারপর বহু কণ্টকময় ক্ষেত্রের উপর দিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে একটা সুরম্য স্থানে লইয়া গেল। সেই কণ্টকময় ক্ষেত্রের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল—সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রমীলাসুন্দরী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—যোড়করে বিকটাকার মনুষ্য দুইটার নিকট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু সেই পাষাণহৃদয় মনুষ্য দুইটা তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত না করিয়া একেবারে তাঁহাকে সেই সুরম্য স্থানে লইয়া যাইয়া উপস্থিত করিল। সেইখানে একখণ্ড উচ্চ বেদিকার উপর নানা মণিমুক্তা বিভূষিত এক

বহুমূল্য আসনে জনৈক শান্ত সৌম্য মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন; প্রমীলা সুন্দরী কিয়ৎক্ষণ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গগত পিতৃদেব। প্রমীলাসুন্দরী মহাপুরুষের নিকট কাতরবচনে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাপুরুষ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না; গম্ভীরবচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—প্রমীলা! তোমার ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই; এখনও তোমাকে ইহাপেক্ষা কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তুমি অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিলে; শৈশবের আমাদত্ত সমস্ত শিক্ষার প্রতি পদাঘাত পূর্ব্বক মনুষ্যত্বের বর্জ্জন করিয়া পশুত্বের অভিনয় করিয়াছিলে।" একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, তুমি তোমার পরমপূজনীয়া শাশুড়ী ও ননদের প্রতি অসময়ে কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলে? আর তোমার স্বামী যে বর্ত্তমানে মনুষ্যচর্ম্মাবৃত পশুবিশেষে পরিণত হইয়াছে, তোমার ঘোর শৈথিল্যই কি তাহার প্রধান কারণ নহে? তোমাকে এখনও ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে—তোমার মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে যদি তোমার শাশুড়ী ও ননদকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে তোমার দণ্ডের মাত্রা কতকটা লঘু হইতে পারে।" এমন সময়ে প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতেছে, দারুণ ভয়ে সমস্ত গা কাঁটাদিয়া উঠিয়াছে; তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে, ভগবান অংশুমালী মাথার উপরে হেলিয়া পড়িয়া প্রখর কিরণজালে ধরাতল উত্তপ্ত করিতেছেন। প্রমীলা সুন্দরী তাড়াতাড়ি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বার্দ্ধক্য আসিয়া হরিপ্রিয়ার দেহ বহুপূর্ব্বেই অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল; তবে ইদানীং তিনি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, ক্ষুধাশক্তিও একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে অকস্মাৎ তাহার বিষম কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইল—আহার শক্তিও একেবারে স্বল্পতা প্রাপ্ত হইল। ফলে তাঁহার অন্নাহারের আর শক্তি রহিল না; একমাত্র দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই আর এক্ষণে তিনি পরিপাক করিতে পারিতেন না। হরিপ্রিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে, তাই তিনি কন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার একমাত্র অন্তিম বাসনার কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন;—বলিলেন "সব সাধইত পূর্ণ হইল, কেবল একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষা এখনও অবশিষ্ট আছে; মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার বীরু ও বউমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" ভুবনমোহিনী তৎক্ষণাৎ বীরেশ্বরকে পত্র লিখাইয়া দিলেন। অন্যান্য কথার পর পত্রে লিখিত হইল,—"শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃদেবীর আর জীবনের আশা নাই, কখন কি হয় বলা যায় না। তাই বউ ঠাকুরাণী ও আপনাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন; মরিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। অতএব তাঁহার জীবনের এই অন্তিম বাসনাটী পূর্ণ করিবেন—পত্রপাঠ বউঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিবেন

বিলম্বে হয়ত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর না হইতেও পারে।" যথাসময়ে পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু বীরেশ্বর বাড়ী আসিল না; তাহার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল। বীরেশ্বর ভগ্নীকে লিখিয়াছে;—"তোমার পত্র পাইলাম। বুড়ী মরিবে লিখিয়াছ? ভয় নাই, এত সহজে সে মরিবে না। তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক যন্ত্রণা ভোগ লেখা আছে। বোধ হয় 'ঢলাইয়া' কিছু টাকা আদায় করিবার জন্য আমাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছে; কিন্তু আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে তাহার কথায় প্রতারিত হইব। বুড়ীর মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে আমাকে দিও। ইতি" বীরেশ্বরের এই পত্র পাইয়া ভুবনমোহিনী যারপরনাই মর্ম্মাহতা হইলেন; তাঁহার পরমারাধ্যা জননীর একমাত্র অন্তিম বাসনা যে বীরেশ্বর পুত্র হইয়া পূর্ণ করিলনা, বরং জননীর এই সস্নেহ আহ্বানেও কূট অভিসন্ধির আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহা ভাবিয়া—বীরেশ্বরের এই বিষম বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিয়া তিনি দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন। আর মরণোন্মুখিনী বৃদ্ধা হরিপ্রিয়া পুত্রের এই পত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট দুর্ব্বল হৃদয়ে যে দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিব? বিষাদের মলিন হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা কহিলেন,—"ভুবন! মা আমার! বীরু আমার কথা বিশ্বাস করে নাই? হায়! দেবতা এতদিনেও তাহাকে সুমতি দিলেন না! তা হউক মা, সে আমার অবোধ ছেলে; তাহাকে বলিও, আমি মরিবার সময় তাহাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি। আর বৌমাকে বলিও, তাকে লইয়া সংসার করিবার ত' আমার সৌভাগ্য হইল না; তথাপি আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি;—যেন তাহার স্বামী-

পদে অচলা ভক্তি হয় ; যেন সে চিরায়ুষ্মতী হইয়া পিতৃ ও শ্বশুর কুলের গৌরব বৃদ্ধি করে।" সেই দিনই শেষরাত্রে হরিপ্রিয়া বিল্বতলায় শ্রীদুর্গা নাম করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে ভুবনমোহিনী তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে পদ্মা সৈকতে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আজন্ম মাতৃস্নেহ পালিতা ভুবনমোহিনী মাতৃ-বিরহের অসহ্য শোকে হৃদয়ে যে কঠিন আঘাত পাইলেন, এতদিন সংসারের বহু ঘাত প্রতিঘাত—বহু দুঃখ কষ্টেও কখনও সেরূপ আঘাত পান নাই। যেদিন তিনি তাঁহার ইহ সংসারের সর্ব্বস্বধন স্বামী দেবতাকে ভাগীরথীর সৈকতভূমে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিনের সেই কালমুহূর্ত্ত হইতে সংসারের অনন্ত দুঃখ অনন্ত কষ্টের মধ্যে পতিত হইলেও একমাত্র জননীর স্নেহময় বাণী শুনিয়া সংসারের সেই সব দুঃখ সব কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই পরম স্নেহময়ী জননীও যখন তাঁহাকে সংসারের দুর্গম কান্তারে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগেলেন, তখন আর জীবন ধারণে তাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না ; তিনি দেবতার চরণে দিনরাত্রি আপনার স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যথাসময়ে বীরেশ্বরের নিকট তাহার মাতার মৃত্যু সংবাদ প্রেরিত হইল। বীরেশ্বর যখন এই সংবাদ পাইল, তখন মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল; ভাবিল, 'মরিয়াছে—আপদ গিয়াছে; আর একটা মরিলেই সব বালাই চুকিয়া যায়। যাহা হউক মার শ্রাদ্ধের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ছুটী লইয়া সে বাড়ী গেল, কিন্তু প্রমীলার অশেষ অনুনয় বিনয় সত্বেও তাঁহাকে সঙ্গে লইল না। বাড়ীতে যাইয়াই বীরেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে ভুবনমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা টাকা কড়ি কত কি রাখিয়া গিয়াছে?" বীরেশ্বরের এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া ভুবনমোহিনী অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের দেরী সহিল না; সে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ পুনরুক্ত করিল। এবার ভুবনমোহিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি কি ভাবিয়া যে এ কথাটা কহিলে, তাহাত আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমাদের প্রতিপালন করাত দূরের কথা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইয়া আমাদিগের একটা সংবাদ পর্য্যন্ত লইতে না। কি ভাবে যে আমাদের দিন গিয়াছে, তাহা একমাত্র মহামায়াই জানেন; অন্যে শুনিলে বিশ্বাস করিবে কি না জানি না। কতদিন অনাহারে, কত দিন অর্দ্ধাহারে অতিবাহিত হইয়াছে; দুধের ছেলে প্রবোধ না খাইতে পাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে। আজি কয়বৎসর হইতে প্রবোধ তাহার বহুশ্রমার্জ্জিত বৃত্তির টাকাগুলি অম্লানবদনে সংসারের জন্য দান করিয়া আসিতেছে, তাহাতেই আমরা একমুঠা করিয়া ভাত পাইতেছি মাত্র। আর তুমি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, মা কত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন?"

ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া বীরেশ্বর তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল; অত্যন্ত কর্কশস্বরে কহিল—"ভুবন! আমি সব জানি; আমার কাছে

সব চালাকী কিছুতেই খাটিবে না। এখন ভালয় ভালয় টাকাগুলি বাহির করিয়া দিবে দাও, নতুবা তোমার অদৃষ্টে ভাল হইবে না, ইহা আমি বলিয়া দিতেছি।" এবার ভুবনমোহিনী আর থাকিতে পারিলেন না, বীরেশ্বরের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দাদা! তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই; ভাই হইয়া তুমি আমার একটা কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলে না? আমি কি তোমার যৎসামান্য টাকা লইয়া বড় মানুষ হইব? এই নাও—যখন আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, তখন তুমি স্বয়ং আমার বাক্স তোরঙ্গ খুলিয়া দেখ।" এই বলিয়া ভুবনমোহিনী তাঁহার চাবির গোছাটা বীরেশ্বরের পদতলে ফেলিয়া দিলেন। বীরেশ্বর ভুবনমোহিনীর এই স্পষ্ট জবাবে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চটিয়া গেল; চাবির গোছা না উঠাইয়াই চিৎকার করিয়া কহিল,—"ভুবন! এখনও বলিতেছি, আমার কাছে ওসব চালাকী খাটিবে না; তুমি এতদিনে সমস্ত টাকা যে এ বাড়ী হইতে পার করিয়া ফেল নাই, তাহার প্রমাণ কি? তাই আবার বলিতেছি, যদি ভাল চাও তবে সব টাকা এখনই বাহির করিয়া দাও; নতুবা তোমার অদৃষ্টে নিতান্তই মন্দ ঘটিবে, তাহা আমি এই মুহুর্ত্তেই বলিয়া দিতেছি।" ভুবনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তুমি ভাই হইয়া এমন কথা বলিতেছ! হা ভগবান! এ লজ্জা অপেক্ষা যে আমার মৃত্যুই ভাল ছিল। কেন আমাকে যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্য এ পৃথিবীতে রাখিয়াছিলে?" কিন্তু ভুবনমোহিনীর এই করুণ ক্রন্দনেও পাষাণ হৃদয় বীরেশ্বরের চিত্ত কিছুমাত্র বিগলিত হইল না; সে চিৎকারের মাত্রা আরও সপ্তমে চড়াইয়া কহিল,—"ভুবন! তোমার আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে, তাই তুমি আমাকেও

এমন করিয়া কড়া কথা শুনাইতে সাহস করিতেছ। জান তুমি যে ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে পারি?" ভুবনমোহিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া সহ্য করিতেছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না; দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন,—"দাদা! আমি চিরদুঃখিনী, চিরহতভাগিনী বটে; কিন্তু একেবারে আত্মসম্মান জ্ঞানশূন্যা নহি। আমার মামাশ্বশুর মহাশয় কতবার আমাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কেবল আমি মার স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে পারি নাই বলিয়াই এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবার ভয় দেখাইতেছ? ভয় দেখাইয়া আর কাজ কি? আমি আপনিই বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি।" ভুবনমোহিনীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বীরেশ্বর গর্জ্জন করিয়া কহিল,—"ভুবন! ভুলিয়া গিয়াছকি, কার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছ?" ভুবনমোহিনীও উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"না, ভুলিনাই; ভুলিনাই যে আমার অকৃতজ্ঞ সহোদর ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ করিতোছ।" বীরেশ্বর এবার গগণভেদী চিৎকার করিয়া বলিল,—"যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা! বেরো তুই এখনই আমার বাড়ী থেকে; নৈলে আমি নারীরক্তে ধরাতল কলুষিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।" ভুবনমোহিনী আর কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে একবস্ত্রেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; পশ্চিমাকাশের বক্ষে নিদাঘের শুকতারা বিষ্ণুবক্ষস্থিত স্যমন্তকের ন্যায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মর্ম্মাহতা ভুবনমোহিনী তপ্ত অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার

আশৈশবের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী সেই নৈশ অন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন।

ভুবনমোহিনী চলিয়াগেলে বীরেশ্বর তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ছুঁড়িটা চলিয়া গেল নাকি ?"

ভৃত্য। বোধহয় ; খুঁজিয়া দেখিব কি ?

বী। শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত থাকিলে সুবিধা হইত। গোপনে তাহার অনুসরণ করিয়া দেখ, কোথায় যায়। পেট জ্বলিতে আরম্ভ হইলে আপনিই ফিরিয়া আসিবে ; ডাকিয়া মান বাড়াইবার কিছুমাত্র দরকার নাই।

কিন্তু ভৃত্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন ভুবনমোহিনীর কোন সন্ধান পাইল না, তখন সে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা প্রভুর নিকট বিবৃত করিল। বীরেশ্বর শুনিয়া বলিল,—"গিয়াছে, বালাই গিয়াছে, জঞ্জাল দূর হইয়াছে ; এখন আবার ফিরিয়া না আসিলেই বাঁচি।" ইহার কয়দিন পরেই সে দেশস্থ বাড়ীঘর সমস্ত মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া, মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ না করিয়াই লক্ষ্ণৌএ ফিরিয়া গেল ; ফিরিবার কালে প্রতিবেশীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল ;— "পাড়াগাঁয়ে যতসব ছোটলোকের বাস, আমি কাশীতে যাইয়া মহাসমারোহে সদ্‌ব্রাহ্মণের দ্বারা মার শ্রাদ্ধ করিব।" কিন্তু অতঃপর সে যে কখন মাতৃশ্রাদ্ধার্থ কাশীগমন করিয়াছিল, এরূপ আমরা অবগত নহি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

মাতৃতীর্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ভুবনমোহিনী সেই নৈশ অন্ধকারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া একাকিনী পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি যে কোথায় যাইবেন, তাহা কিছুমাত্র জানেন না। সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্রমহিলার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে একাকিনী স্থানান্তরে গমনও সম্ভবপর নহে; সুতরাং কিয়দ্দূর গমন করিয়াই তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখেই রাস্তা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিন দিকে চলিয়া গিয়াছে; এই স্থানে আসিয়া তাঁহার গতি সহসা বাধা প্রাপ্ত হইল—তিনি কোন্ দিকে যাইবেন তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে অদূরবর্ত্তী একটা ঝোপের মধ্যে একটা কাল পেচক বিকৃত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, অমনি ভুবনমোহিনীর হৃদয় অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সেস্থানে আর তিলার্দ্ধও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; যে রাস্তা দিয়া গেলে পদ্মাতীরে উপনীত হওয়া যায়, সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পথ অতিবাহিত করিবার পর পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। অদূরে কুমারডাঙ্গার শ্মশানক্ষেত্র; এই স্থানে ভুবনমোহিনী তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে জন্মের শোধ বিদায়

দিয়া গিয়াছেন ;—একে একে অতীত জীবনের সমুদয় পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাঁহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। এতক্ষণ ভুবনমোহিনী বড় কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্নেহময়ী জননীর এই অন্তিম শয্যার স্থান দেখিয়া তাঁহার শোকাবেগ একেবারে উথলিয়া উঠিল ; আর তাহা কোন বাধা বিঘ্নই মানিল না। ভুবনমোহিনী সেই পবিত্র পদ্মাসৈকতে তাঁহার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননীর পবিত্র চিতাপার্শ্বে বসিয়া নৈশ-আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। "হায় মা! কেন তুমি তোমার অভাগিনী কন্যাকে এ অনন্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়া চলিয়া গেলে? আমি আর কাহার মুখ চাহিয়া এ অনন্ত যন্ত্রণাময় সংসারক্ষেত্রে অবস্থান করিব? এতদিন কেবল তোমারই স্নেহময় মিষ্টবাণী শুনিয়া সংসারের অনন্ত দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়া আসিয়াছি ; কিন্তু আর যে পারিনা মা। ভ্রাতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া এ পাপ রূপ যৌবন লইয়া আমি কোন দুর্দ্দান্ত দস্যুর আশ্রয় লইতে যাইব? মা পদ্মা! তুমি আমায় কোল দাও; আমি আমার পরম স্নেহময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া আমার এ হৃদয় জ্বালার নিবৃত্তি করিব।"

তখন কৃষ্ণা চতুর্থীর খণ্ডচন্দ্র মধ্যাকাশে বসিয়া রজত কিরণধারায় বিশাল পদ্মাহৃদয়ে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছিলেন। পদনিম্নে বর্ষাবারিপুষ্টা যৌবনান্ধতা পদ্মানদী ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে ভুবনমোহিনীর চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছিলেন। অদূরে পদ্মাবিচরিণী একখানি বজরার ছাতে বসিয়া জনৈক প্রেমিক যুবক উচ্চৈস্বরে প্রেমের গীত গাহিতেছিলেন। যে ভূমি-খণ্ডের উপর বসিয়া ভুবনমোহিনী বিলাপ করিতেছিলেন, বর্ষাবারির প্রবল স্রোতে তাহার মূলদেশ একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে

সেই ভূমিখণ্ড শশব্দে পদ্মাগর্ভে পড়িয়া গেল, ভুবনমোহিনীও সেই ভূমি-খণ্ডের সহিত পদ্মার অতলজলে ডুবিয়া গেলেন।

সেই পদ্মাহৃদয়বিচরিণী বজরার আরোহী যুবক ছাতে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে জনৈকা স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশরাশি পদ্মাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বজ্‌রার মাঝি মাল্লাদিগকে ডাকিয়া সেই মজ্জমানা স্ত্রীলোককে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ইহাকে বাঁচাইতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবেন। বর্ষাবারি পুষ্টা পদ্মায় তখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রখর; মানুষ, গোরু স্রোতের মুখে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই; সুতরাং মাঝি মাল্লার কেহই তাহাদের নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না। তখন যুবক আর কাল বিলম্ব না করিয়া আপনার বস্ত্রাদি সংযত করিয়া সেই প্রখর পদ্মাস্রোতোমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টায় যুবক স্ত্রীলোকটীর সংজ্ঞাহীন দেহ বজ্‌রার উপরে উঠাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন; কিন্তু সে তুষার শীতল দেহে জীবনিশক্তির অস্তিত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি হইল না। যুবক তাহার নাসিকার নিকটে হাত দিয়া দেখিলেন—কিছুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে না। তখন তিনি সেই সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া ধরিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তিনি যুবতীর নাসিকার নিকটে হাত দিয়া দেখিলেন; এবার বোধ হইল যেন অতি ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। বহুক্ষণের এইরূপ চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষায় যুবতী সংজ্ঞালাভ করিয়া কথা কহিতে সক্ষম হইলেন। তখন যুবক একখানি শিবিকা আনয়ন করিয়া যুবতীকে তৎসাহায্যে স্বগৃহে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট সমস্ত

বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদিত করিয়া তাঁহার শুশ্রূষার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিলেন।

এই যুবক কুমারডাঙ্গাবাসী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বড় গৃহিণী ঠাকুরাণীর একমাত্র পুত্র অসীতকুমার। অসীতকুমার যখন তাঁহার বজ্‌রার ছাত হইতে তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা বক্ষে লাফাইয়া পড়েন, তখন বক্ষে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতক্ষণ যুবতীর শুশ্রূষাব্যপদেশে তিনি তাঁহার নিজের আঘাতের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নাই; এক্ষণে গৃহে আসিয়াই তিনি দারুণ বক্ষবেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সুবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই অসীতকুমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

ধন্য অসীতকুমার—তুমিই ধন্য! আজি পরার্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া তুমি যে স্বার্থ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলে, এই ঘোর স্বার্থপর পৃথিবীতে তোমার সে মহৎকার্য্যের তুলনা নাই। যাও অসীত কুমার, দেববাঞ্ছিত স্বর্গধামে যাও, অমরার রত্নময় সিংহাসন তোমার জন্য শূন্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপনার একমাত্র পুত্র অসীতকুমারের অকাল মৃত্যুতে বড় গিন্নির হৃদয়ে পুত্রশোকের দারুণ শেল বিদ্ধ হইলেও তিনি ভুবনমোহিনীর কিছু মাত্র অযত্ন হইতে দিলেন না। তাঁহার মাতৃতুল্য যত্নে ও সেবা শুশ্রূষায় দুই এক দিবসের মধ্যেই ভুবনমোহিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন; এবং তাঁহার মামাশ্বশুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখিয়া দিয়া তাঁহার আগমনের প্রত্যাশায় সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনীর পত্র পাইয়া তাঁহার মামাশ্বশুর রামকমল বাবু তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য গাঙ্গুলী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরেশ্বরের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি ভুবনমোহিনীকে বলিলেন;—"কেন মা, আমি ত বহুদিন হইতেই তোমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এতদিন— এই দীর্ঘকাল এরূপ ভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোমার এখানে থাকিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তুমি আজীবন পিত্রালয়ে থাক, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্য নাই; কিন্তু তুমি যে এরূপভাবে কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" তার পর রামকমল বাবু স্নেহময় মিষ্ট বচনে ভুবনমোহিনীর অন্তরের দুঃখ দূর করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

ভুবনমোহিনী পরম সুখে রামকমল বাবুর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীর অন্তকরণে হিংসাদ্বেষ কখন স্থান পাইত না;

তিনি ভুবনমোহিনীকে আপনার কন্যা নির্ব্বিশেষে যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পুত্রবধূদিগের সকলকে একত্র করিয়া তাহা-দিগকে বলিয়া দিলেন,—"দেখ, তোমরা যেন কেহ কখন আমার ছোট বৌমাকে (ভুবনমোহিনীকে) কড়া কথা বলিও না; বলিলে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইব। সর্ব্বদা তাহার সহিত আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় আচরণ করিবে, যেন সে কখনও কোনরূপ দুঃখ অনুভব না করে। তাহার অকাল বৈধব্যের কথা মনে রাখিয়া সর্ব্বদা তাহার সহিত তোমরা সদয় ব্যবহার করিবে। তোমরা যে ঘরের মেয়ে, তাহাতে তোমাদিগকে এ সকল কথা না বলিলেও চলিতে পারিত। তথাপি আমি পূর্ব্ব হইতে তোমাদিগের সকলকে সাবধান করিয়া দিলাম। স্বয়ং কর্ত্তা ছোটবউমাকে আপনার কন্যার অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন; সে কখনও কোনরূপে ক্লেশ পাইলে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।" শ্বাশুড়ীর এই উপদেশে রামকমল বাবুর পুত্রবধূগণ ভুবনমোহিনীর সহিত সর্ব্বদা আপনাদের কনিষ্ঠাভগ্নীর ন্যায়ই ব্যবহার করিত। ফলে ভুবনমোহিনী বহুকাল দুঃখভোগের পর এতদিনে মামাশ্বশুরের গৃহে আসিয়া মনে যথার্থ শান্তিলাভে সক্ষম হইলেন।

* * * * *

এমনই ভাবে দিন কাটিতেছে, ইহার মধ্যে একদিন ভুবনমোহিনী প্রবোধের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। বহরমপুর হইতে প্রবোধ লিখিয়াছে;—"মা! স্নেহময়ী দিদিমা আমাদিগের স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, এই ভীষণ সংবাদের পরই, অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত মাতুল মহাশয়ের দুর্ব্ব্যবহারে তোমার গৃহত্যাগ, এবং সেই সময়ে পদ্মার তীরভূমি হইতে তোমার নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া

যাওয়ার সংবাদে যে কতদূর মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার নাই। মাগো! এমন করিয়া আর কখন তোমার জীবন বিপন্ন করিও না। সে দিনের সেই দুর্ঘটনায় যদি তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে, তবে কাহার মুখ চাহিয়া তোমার এ অধম সন্তান প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইত? মা! অতি শৈশব হইতেই আমি পিতৃহীন; বিধির বিড়ম্বনায় আমি আমার পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই। আজীবন তোমার ওই চরণদুইখানি পূজা করিয়া আমার সে মনের দুঃখ মিটাইব, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। মাগো! তোমার নিজের জীবনের প্রতি যদি এমন করিয়া অবহেলা কর, তবে তোমার এই অভাগা সন্তানের যে কোন সাধই মিটিবে না। যেদিন হইতে তোমার এ হতভাগ্য সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে, সেইদিন হইতে ত কেবল অনন্ত দুঃখ পরম্পরাই সহ্য করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে আমি যদি তোমার শ্রীচরণ দুইখানি পূজা করিবার অবকাশ না পাই, তবে যে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। মাগো! তোমার এ অবোধ সন্তানকে কেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলে? স্বর্গীয়া দিদিমার প্রতি মামি মার আচরণ দেখিয়া মনে হয় যে আমি চিরজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করিলেই ভাল করিতাম। যদি তুমি তোমার এ হতভাগা পুত্রের পত্নীর আচরণে মনে কখনও কোন ক্লেশ পাও, তবে যে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। মাগো! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণে ভক্তিপ্রীতি রাখিতে পারি।

মা! বাটী হইতে আসিবার সময় আমি যে তোমার চরণামৃত আনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আর এক বোতল চরণামৃত পার্শ্বেল যোগে পাঠাইয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নানান্তে

যখন আমি তোমার চরণামৃত পান করি, তখন আমি যে স্বর্গসুখ অনুভব করি, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোমার চরণামৃত পান করিবামাত্র দেহে যেন আমার নূতন জীবনি শক্তি ফিরিয়া আসে; মনে তখন অসাধারণ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। তোমার ওই চরণ দুইখানিই যে আমার মহাতীর্থ; সেই মহাতীর্থের স্পৃষ্ট একবিন্দু সলিলও যে আমার নিকট গোমুখী নিসৃত গঙ্গা ধারা অপেক্ষাও পবিত্র। এই পরম পবিত্র মহোদক হইতে যে দিন বঞ্চিত হইব, সে দিন আর জীবন ধারণে লাভ কি ?

আমি শারীরিক ভাল আছি। পত্রোত্তরে তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তাদূর করিবে। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

"তোমার স্নেহের প্রবোধ।"

প্রবোধের এই পত্র পাইয়া ভুবনমোহিনীর হৃদয় হর্ষে ও গর্ব্বে ভরিয়া গেল; তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি দেবতার চরণে অহঃরহঃ প্রবোধের মঙ্গল কামনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে প্রবোধ বঙ্গের কাব্যজগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বি, এ, পাঠকালেই তাহার একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবামাত্র সে চারিদিক হইতে প্রশংসার মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত হইতে লাগিল। জনৈক প্রথিতনামা সম্পাদক এই নূতন পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিলেন,—"মহাকবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বাঙ্গালীকে আর কেহ এরূপ ভাবে কাব্যের ঝঙ্কারে মোহিত করিতে পারে নাই। আমরা বালক কবির এই অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র কেবলমাত্র এই একখানি পুস্তকের জন্যই বঙ্গে অমর হইয়া থাকিবেন, তাহা আমরা অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। বালক কবির লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।" কিন্তু প্রবোধের এই অসাধারণ সৌভাগ্য দর্শনে অনেকেই দারুণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল, এমন কি তাহার গৌরবহ্রাসের জন্য অনেকে দস্তুরমত চেষ্টাচরিত্র করিতেও ক্রটী করিল না। জনৈক লেখক প্রবোধের গৌরব হরণ করিবার জন্য একই সঙ্গে তাঁহার দুইখানি পুস্তক যন্ত্রস্থ করিলেন, এবং তাঁহারই জনৈক অনুপুষ্ট স্তাবক কোন একখানি মাসিকপত্রে প্রবোধের বিরুদ্ধে তীব্র হলাহল উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত ছিল;—সম্প্রতি বহরমপুর কলেজের জনৈক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ছাত্রের লিখিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই লইয়া কলিকাতার কোন একখানি অতিকায় মাসিকের সম্পাদক

কলুবাড়ীর তৈলভাণ্ডার নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রশংসার কলগুঞ্জনে আমাদের কান বধির হইবার উপক্রম হইল। * * * মৃত মহাকবি হেমচন্দ্রের পরে নাকি বাঙ্গালীকে কেহ এরূপ কাব্যের ঝঙ্কার শুনাইতে সক্ষম হয় নাই। আশ্চর্য্য নহে কি ? যাহারা শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি দাস মহাশয়ের কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে বর্ত্তমানকালের জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশ অন্ধ, তাই গুণীব্যক্তির আদর করিতে জানে না। অন্য যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে জনসাধারণ এতদিন তাঁহার স্বর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিত ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এদেশের লোক এতদিনেও এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবির আদর করিতে শিখিল না। * * সপ্তদশবর্ষ বয়ক্রমকালে আমি এই মহাকবির প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তদবধি আমি প্রতিদিন ইহার গ্রন্থগুলি নিয়মিত ভাবে পাঠ করিয়া আসিতেছি। যখন আমি ইঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করি, মনে হয়, তখন যেন আমি কোন স্বর্গীয় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকি। মন আমার তখন অপূর্ব্ব ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, এবং জগতের দুঃখ কষ্ট সমুদয় ভুলিয়া গিয়া মনে আমি অপূর্ব্ব শান্তিলাভে সক্ষম হই।" কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা কখন লুক্কায়িত থাকে না ; ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় উহা স্ব—শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অহঃরহঃ এইরূপ তীব্র হলাহল উদ্গীরণে নবীন কবি প্রবোধচন্দ্র মনে একটা দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেও মাতৃভাষার সেবা পরিত্যাগ করিল না—বরং নূতন উদ্যমে আর একখানি খণ্ড কাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত পরশ্রীকাতর পণ্ড সম্প্রদায় তাহাদের সমস্ত কৌশলজাল ব্যর্থ

হইল দেখিয়া ঘোর গাত্রজ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে ইহারা প্রবোধচন্দ্রকে সাহিত্যসেবা হইতে বিরত করিবার জন্য একটী সুকৌশলপূর্ণ অভিনব পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

একদিন বহরমপুর কলেজের ছাত্রাবাসে জনৈক পর্য্যটক আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রবোধের সাহিত্যসেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আপনার ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আপনি শুধু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। বাঙ্গলা রচনার পরামর্শ আপনাকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু এ ভূতের বেগার খাটিয়া আপনি কি করিবেন? হাজার হাজার উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিলেও আপনি এ দেশে এইটুকু মানসম্ভ্রম পাইবেন না; পক্ষান্তরে ইংরাজীতে একখানি মাত্র পুস্তক লিখিলেই আপনি রাজদ্বারে অসাধারণ প্রতিপত্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন, এবং স্বয়ং সম্রাট আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া আপনার অসাধারণ গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।" কিন্তু প্রবোধচন্দ্র অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিল,—মহাশয়! আমি খ্যাতি বা প্রতিপত্তির ভিখারী নহি; সেজন্য লেখনী ধারণও করি নাই। আমার গুরুদেবও আমাকে সেরূপ উপদেশ দেন নাই। যাঁহারা কেবল মাত্র যশের জন্য সাহিত্যসেবায় ব্রতী হয়েন, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমায় ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করিতে বলিতেছেন? ক্ষমা করিবেন—আমি আপনার এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিব না। লোক শিক্ষাই গ্রন্থপ্রণয়নের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য; যদি সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ না হইল, তবে শুধু যশের জন্য ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া কি লাভ হইবে বুঝিতে

পারি না। যদি আমি আমার অভিজ্ঞতার ফলভোগী আমার দেশকে করিতে না পারিলাম, যদি আমি আমার জাতীয় সাহিত্যের সেবা ও পরিপুষ্টি করিতেই না পারিলাম, তবে অনর্থক বিদেশীর নিকট হইতে বাহবা লইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়া কি ফল হইবে? যদি আমি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক হই; যদি আমি আমার জাতীয় সাহিত্যে প্রকৃতই তেমনি কিছু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই, তবে বিদেশীরা আপনা হইতেই আমার পুস্তকগুলি তাঁহাদের ভাষায় অনূদিত করিয়া আমার এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাতৃভাষার অসাধারণ গৌরব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই।" প্রবোধের এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া পর্য্যটক মহাশয় একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমায় ক্ষমা করুন; আপনি বয়সে বালক বটে, কিন্তু জ্ঞানে আপনি অত্যন্ত প্রবীণ। আপনার ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র মাতৃভাষার সেবা পরিত্যাগ করিলে দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিব। আপনার পুণ্যময় লেখনী অক্ষয় হইয়া উত্তরোত্তর দেশের ও দশের হিতে প্রযুক্ত হউক, দেবতার চরণে ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কই সে বিদ্যালয় স্থাপনের কি হইল?"

"ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছ?"

"হাঁ।"

"অর্থাভাবে এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই; তবে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করিতেছি না।"

পুণ্যাত্মা মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহার করিতে বসিয়াছেন, অদূরে তাঁহার সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী সুমিত্রা বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। কথায় কথায় সুমিত্রা তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল। মহেশ্বরের উত্তর শুনিয়া সুমিত্রা বলিলেন,—"এ বড় আক্ষেপের কথা; বহু পুণ্যফলে দেবতার আশীর্ব্বাদে আমরা প্রভার ন্যায় কন্যা ও প্রবোধের ন্যায় জামাই লাভ করিতে পারিয়াছি। কে জানিত যে আমাদের ভাগ্যে এতসুখ লেখা আছে? আমার অমন সোনার জামাইএর একটা কথা তুমি রাখিবে না?" মহেশ্বর হাসিয়া বলিলেন,—"কই, আমিত এমন কথা বলি নাই। তবে একার্য্য অর্থ সাপেক্ষ; আমার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না।"

সুমিত্রা। তবে আমার প্রবোধের এই মনের আকাঙ্ক্ষা কি মনেই থাকিয়া যাইবে?

মহেশ্বর। দেবতা জানেন কি হইবে। আবশ্যকীয় অর্থ যে কি করিয়া সংগৃহীত হইবে; তাহা ত ভাবিয়া আমি পাই না।

সুমিত্রা। আচ্ছা, পাষাণপুরের মহারাজার শরণাপন্ন হইয়া দেখিলে হয় না? আমার ত' মনে হয়, তিনি এরূপ মহৎ কার্য্যের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কথনই কুণ্ঠিত হইবেন না।

মহেশ্বর। তোমরা অন্দরমহলে আবদ্ধ থাক, দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না। আমাদের দেশের জমীদারগণের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বই থাকিবে, তবে আর দেশের এরূপ দশা হইবে কেন? পাষাণপুরের মহারাজার কথা বলিতেছ? তাঁহার সমুদয় রাজ্য দুর্ভিক্ষে ও প্লেগে উৎসন্ন যাইতেছে, আর তিনি কলিকাতায় বসিয়া কলুবাড়ীর তৈলভাণ্ডার নিঃশেষ করিতেছেন। এই সেদিন তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি সাহেবের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দশলক্ষ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের দরবারে অসাধারণ দাতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে কোন ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি সামান্য একমুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত পায় না। এরূপ ব্যক্তির নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা নহে কি?

সুমিত্রা। তিনি না হয় নাইবা কিছু দিলেন; কিন্তু আরও ত' কত রাজা জমীদার ও বড়লোক আছেন। একবার কলিকাতায় গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ অর্থ সংগ্রহ হয় কিনা।

মহেশ্বর। সত্যকথা বলিতে কি সুমিত্রা, কলিকাতার নাম শুনিলেই যেন আমি একটা ঘোর অশ্বস্তি অনুভব করি। এই কলিকাতাই বাংলার সমগ্র পল্লীগ্রামের ধ্বংস হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। আমার সাধ্য থাকিলে আমি এই মুহূর্ত্তে কলিকাতা নগরীর ধ্বংস করিয়া উহারই মালমসলার দ্বারা বাংলার সর্ব্বত্র অসংখ্য

এক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরের প্রতিষ্ঠা করিতাম। ওই ব্যভিচার ও রাজযক্ষ্মার লীলাভূমি বাংলার সমগ্র ধন ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া বিদেশীর পায় ঢালিয়া দিতেছে। এই খানেই বাংলায় জমীদাররূপ ক্ষুদে লাটগণ পল্লীর রক্ত শোষণ করিয়া বিলাস ও ব্যভিচারে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। ও পাপপুরী দর্শনে আমি আমার জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট করিতে পারিব না।

সুমিত্রা। তুমি যে কি হইলে বলিতে পারি না। কলিকাতা মহানগরী বাঙ্গালীর একটা গর্ব্বের জিনিষ; এই খানেই না দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ও যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব বিরাজ করিয়াছিলেন?

মহেশ্বর। তা করিয়াছিলেন সত্য; খোঁজ করিলে দেখা যাইবে বাংলার অনেক পল্লীই অমন কত কত মহাপুরুষের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সকলের পুণ্যরাশি বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি? এইত সেদিন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের চরণরেণু স্পর্শে নবদ্বীপধাম ধন্য হইয়াছিল; কিন্তু সেই নবদ্বীপের দশা এক্ষণে যাইয়া একবার দর্শন করিয়া আইস; চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। ফলকথা কেবল অতীত গৌরবের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকিলে বর্ত্তমানে কাহারও রক্ষা নাই। কলিকাতায় যে ব্যভিচারের স্রোত দিবারাত্রি চলিয়া থাকে, তাহা যদি একবার স্বচক্ষে দর্শন কর, তাহা হইলে হয়ত কায়মনোবাক্যে সীতাদেবীর মত প্রার্থনা করিবে, "হে ধরিত্রী! তুমি বিদীর্ণ হও; আমি তোমার জঠরে প্রবেশ করি।"

সুমিত্রা। বেশ; তাহা হইলে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার কি কোন আশাই নাই?

মহেশ্বর। আমি কষ্টে স্বষ্টে অর্দ্ধেক টাকার ব্যবস্থা করিতে পারি; কিন্তু অপরার্দ্ধ কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে?

সুমিত্রা। আমার যাহা কিছু অলঙ্কার আছে, সমস্তই এই কার্য্যের জন্য দান করিতেছি। ইহাদ্বারা আরও কতক অর্থের ব্যবস্থা হইবে।

মহেশ্বর। সেকি, সমস্ত অলঙ্কারই অর্পণ করিবে?

সুমিত্রা। হাঁ—সমস্তই। এয়োতির চিহ্নস্বরূপ কেবল শাঁখা আর লোহার বালা রাখিব; অবশিষ্ট সমস্তই বিদ্যালয়ের জন্য অর্পণ করিব।

মহেশ্বর। তাহাতেও ত' কুলাইবে না; আরও অনেক টাকার দরকার হইবে।

অদূরে হেমপ্রভা বসিয়া মনোযোগ সহকারে পিতামাতার এই কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। মাতাকে তাঁহার গহনা দান করিতে দেখিয়া সে তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—"মা! আমিও আমার সব গহনা বিদ্যালয়ের জন্য দান করিব।" মহেশ্বর ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সেকি মা! তুমি ছেলে মানুষ; তুমি কেন গহনা দিতে যাইবে?" প্রভা আব্দার ধরিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা, আমিও আমার সব গহনা দিব।" মহেশ্বর পুনর্ব্বার বলিলেন;—"তা হয় না মা, আমি তোমার গহনা লইতে পারিব না।" এবার প্রভার চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন মহেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"ছি মা, কাঁদ কেন? তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তেমনই কর।" তখন প্রভা তাহার অঙ্গের সমুদয় অলঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া তাহার মাতার চরণপ্রান্তে রক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার সহচরী চপলা আসিয়া সুমিত্রাকে বলিল,—"বড় মা! প্রভা বলিয়াছে যে আর সে সোনার গহনা পরিবে না। সে বড় ফুল ভালবাসে; এখন কেবল ফুলের গহনাই পরিবে। বুঝি তাইদিয়া

ওর বরকে বশ করিয়া রাখিবে।" প্রভা অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া চপলার গালে একটা চড় মারিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে প্রবোধ বহরমপুর কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার এম, এ, পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু প্রবোধ তাঁহাদের এই সাদর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না; সসম্ভ্রমে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই প্রবোধের চির-আকাঙ্ক্ষিত তপোবনের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় উন্মুক্ত হইল। প্রবোধ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে মাসিক আড়াইশত টাকা বেতনের অধ্যাপকের পদ ধূলি মুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পঞ্চাশ টাকা বেতনে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিল; এবং অসাধারণ উদ্যমে উহার উন্নতিকল্পে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল।

অধ্যক্ষের অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তপোবনের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় হিন্দুস্থানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। তবে এইস্থান হইতে উপাধিলাভ করিলে চাকুরীলাভ সহজ হইত না বলিয়া ইহাতে

আশানুরূপ ছাত্রসমাগম কিছুতেই হইল না। প্রবোধ দেশবাসীর এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেও কিছুতেই হতাশ হইল না। কঠোর পরিশ্রম সহকারে ছাত্রগণকে 'মানুষ' করিয়া দিতে লাগিল। যে সকল যুবক এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা, এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের উন্নত চরিত্র, সুন্দর সুগঠিত দেহ ও অসাধারণ শারীরিক বল দেখিয়া দেশের আপামর জনসাধারণ বিস্মিত হইয়া পড়িল।

এই বিদ্যালয়ে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজ ও বানিজ্যনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারের বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হইত, অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিল। প্রত্যহ অধ্যাপকগণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। অনধিক আট বৎসরের বালকগণকে ভর্ত্তি করিয়া চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে শিক্ষাধীনে রাখা হইত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রের শয়ন পর্য্যন্ত বালকগণের প্রত্যেক কার্য্য শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। ত্রিসন্ধ্যায় যখন এই বিদ্যালয়ের বালকগণ হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মধুর স্বরে সকলে বেদগান করিতে থাকিত, তখন সত্যই মনে হইত প্রাচীনযুগের ঋষিমুনিগণের তপোবন যেন চক্ষের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের সেই হোমকুণ্ড হইতে পবিত্র হবির্গন্ধ যখন পবন সহযোগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন পল্লীবাসীরা মন্ত্রাকৃষ্টের মত সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়া নীরবে সেই স্বর্গীয় পদার্থ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত। আবার যখন এই সকল বালক সময়ান্তরে শস্ত্রবিদ্যা, বিশেষ করিয়া ভারতের লুপ্তপ্রায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিত; তখন প্রকৃতই মনে হইত, যেন আচার্য্য দ্রোণের

তত্ত্বাবধানে কৌরব বালকগণ শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক তপোবন বিদ্যালয়ের বালকগণের ছোট বড় সকল কার্য্যই কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। পাছে ইহারা অসৎসঙ্গে মিশিয়া আপনাদের চরিত্র অবনত করিবার সুযোগ পায়. এই নিমিত্ত সর্ব্বক্ষণের জন্য তাহাদের সঙ্গে একজন করিয়া শিক্ষক অবস্থান করিতেন। ছাত্রগণ এক মুহূর্ত্তের তরেও শিক্ষকের সঙ্গত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারিত না। এমনকি শয়নকালেও ইহাদের মধ্যস্থলে শিক্ষক অবস্থান করিতেন। এই সুন্দর ব্যবস্থার ফলে তপোবন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেরূপ অন্যান্য বিদ্যার সহিত সুন্দর শারীরিক বলে বলিষ্ঠ হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহাতে সমগ্র হিন্দুস্থান ইহার শিক্ষাদান প্রণালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ইহার প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজি হেমপ্রভা সর্ব্বপ্রথম স্বামী-সম্ভাষণে আসিয়াছে। প্রবোধের পাঠ্যাবস্থা এক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং শ্বশুরবাড়ীতে আসিলে যখন সুমিত্রা তাহাকে অন্দরমহলে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে শ্বাশুড়ীর আদেশ অমান্য করিতে পারিল না।

রাত্রিতে আহারাদি সমাপনান্তে প্রবোধ বিছানায় শুইয়া শুইয়া গাঢ় মনোযোগ সহকারে একখানি মাসিক পত্র পাঠ করিতেছিল, এমন সময়

হেমপ্রভা সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সলজ্জ ধীর পদ বিক্ষেপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের দরজা অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া সে ধীরে ধীরে প্রবোধের চরণে প্রণাম করিল, তারপর বিছানার উপর না উঠিয়া প্রবোধের পদপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবোধ মাসিক পত্রের একটী সন্দর্ভ পাঠে এতই নিবিষ্ট চিত্ত ছিল যে, হেমপ্রভা কখন আসিয়াছে তাহা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে সহসা হেমের হস্তস্পর্শে চাহিয়া দেখিল যে তাহার কিশোরী পত্নী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছে। প্রবোধ হেমপ্রভার অপূর্ব্ব ফুলসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইল—সাদরে তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গাঢ় প্রেমভরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল,—"ফুলরাণী আমার! এ অপূর্ব্ব ফুলসাজে তোমায় কে সাজাইল ?" প্রভা সাতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল—"আমি কত নিষেধ করিলাম, তবু চপলা আমাকে জোর করিয়া এই সকল ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছে।" প্রবোধ হাসিয়া কহিল,—"তবে চপলা নিশ্চয়ই আমার কাছে পুরস্কারের দাবী করিতে পারে।" তারপর প্রভার আপাদ মস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—"একটা নূতন ব্যাপার দেখিতেছি।"

প্রভা। কি নূতন ব্যাপার দেখিতেছ ?

প্রবোধ। তুমি আশৈশব অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয় ছিলে, কিন্তু আজি তোমার এই প্রথম স্বামী-সম্ভাষণের রাত্রে তোমার গায়ে একখানিও সোনার অলঙ্কার দেখিতেছি না। বিস্ময়ের বিষয় নয় কি ?

প্রভা। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া অলঙ্কার পরিধান পরিত্যাগ করিয়াছি।

প্রবোধ। সে কি ; কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ ?

প্রভা। কেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শুনিবে ? আমি দরিদ্রের কন্যা, এবং দরিদ্রের পুত্রবধূ। কিন্তু পাছে আমি যুগধর্ম্মের প্রভাবে আত্মবিস্মৃত

হইয়া অলঙ্কারের জন্য স্বামীদমনে প্রবৃত্ত হই, পাছে আমি তোমার হৃদয়ে কোনরূপ অশান্তি উৎপাদনের কারণ হই, তাই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এ জীবনে কখন অলঙ্কার পরিধান করিব না।

হেমপ্রভার কথা শুনিয়া প্রবোধ আহ্লাদে গদ্গদ হইল; সাদরে আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল,—"তুমি আমার জীবনের শান্তি স্বরূপিনী; এত বুদ্ধি তোমার?" হেমপ্রভা প্রবোধের বক্ষস্থলে মুখ রাখিয়া কহিল,—"প্রাণাধিক, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।"

প্রবোধ আগ্রহভরে বলিল,—"কি প্রভা?

প্রভা। এত আনন্দ, এত হাসি তামাসার মধ্যেও তোমার হৃদয়ে একটা বড় বিষাদের কালিমা দেখিতে পাইতেছি। কেন প্রাণনাথ?

প্রবোধ। শুনিবে, কেন?

প্রভা। যতক্ষণ আমি তাহা না শুনিব, ততক্ষণ মনে কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিব না।

প্রবোধ। সে আমারই দুর্ভাগ্যের কথা, তুমি তাহা শুনিও না।

প্রভা। আমি মনে ক্লেশ পাইব সেই ভয় করিতেছ? তেমন ভয় করিও না; বরং না শুনিলেই আমি মনে ক্লেশ পাইব।

প্রবোধ। দেখ প্রভা, আমি শৈশব হইতেই পিতৃহীন। মা আমাকে দারিদ্র্যের সহস্র কষাঘাত সহ্য করিয়া বড় দুঃখে ও বড় কষ্টে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু হতভাগ্য আমি—আমি এতদিনেও আমার সেই দেবীসদৃশী স্নেহময়ী জননীর দুঃখ দূর করিতে পারিলাম না। আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ আর কে আছে প্রভা? মা'র সেই দুঃখক্লিষ্ট বিষাদমলিন মুখের কথা মনে হইলে আমি অহঃরহঃ হৃদয়ে অসহ্য বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করি। মাকে আমার এখনও অসুখী রাখিয়া আমি যে এমন

ভাবে বিলাসসুখে মগ্ন রহিয়াছি, ইহা আমার অসারতারই চূড়ান্ত নিদর্শন নহে কি?

প্রভা। বল প্রিয়তম, কি করিলে মা আমার সুখী হইবেন। আমি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও যদি মাকে সুখী করিতে পারি, তবে তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

প্রবোধ। অবোধ বালিকা তুমি; প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াই কি মাকে সুখী করিতে পারিবে? যদি পার তবে ভক্তি-প্রীতি ও সেবার দ্বারাই পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি—আমি এখনও গৃহহীন। স্নেহময়ী মাকে আমার এখনও পরগৃহে অবস্থান করিতে হয়। সত্য বটে দাদা মহাশয় মাকে আমার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাহা পরগৃহ। বনের মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম যেমন স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেও কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারে না, মাও আমার তেমনি সতত দাদামহাশয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য বিভবের মধ্যে থাকিয়াও হৃদয়ে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহার এ দুঃখের কথা কি ভুলিবার? তিনি বড় সাধ করিয়া আমার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রবধূর সেবা শুশ্রূষা লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ভাল করিয়া ঘটিয়া উঠিল না। কোথায় তিনি স্বগৃহে গৃহিণীপদে সমাসীন থাকিয়া তোমার সেবা পরিচর্য্যায় সাংসারিক দুঃখ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিবেন, না তাঁহাকে পরগৃহে নিতান্ত দুঃখিনীর ন্যায় কালযাপন করিতে হইতেছে। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য নহে কি?

প্রভা। মাকে এইখানেই লইয়া আসিলে হয় না?

প্রবোধ। শ্বশুরগৃহে মাকে লইয়া আসিব? প্রাণ থাকিতে আমি তাহা কিছুতেই করিতে পারিব না।

প্রভা। তবে যতদিন বাড়ী করা না হইতেছে, ততদিন এই স্থানেই একটী পৃথক বাসা করিবার ব্যবস্থা কর; এবং মাকে অবিলম্বে সেস্থানে লইয়া আইস। আমি আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়াও মাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহাকে ও তোমাকে অসুখী রাখিয়া আমি পিতৃগৃহে থাকিবার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত নহি।

প্রবোধ। অগত্যা তাহাই করিতে হইবে। আর তোমাকেও আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তোমার আচরণে মা যেন কথনও কোনরূপে অসুখী না হয়েন। পৃথিবীতে আর সমস্তই সহিতে পারিব, পারিব না শুধু মা'র মনে কোনরূপে ক্লেশ দিতে। যদ্যপি তুমি মাকে আমার সতত সুখে রাখিতে পার, তবেই আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে। যে আমার দেবীসদৃশী স্নেহময়ী মা'র কিঞ্চিন্মাত্রও অসুখের কারণ হইবে, সে ব্যক্তি যেই হউক না কেন, তাকে আমার ভীষণ শত্রু বলিয়াই মনে করি।

প্রভা। সেবাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যদ্যপি তুমি আমাকে মা'র সেবায় নিযুক্ত কর, তাহা হইলে সেটী আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করা কি সকলের ভাগ্যেই ঘটে?

প্রবোধ। বেশ আজীবন এই কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে প্রকৃতই তুমি আমার জীবনের শান্তিস্বরূপিণী হইতে পারিবে।

এই বলিয়া আবার প্রবোধ গাঢ় প্রেমভরে হেমপ্রভার মুখচুম্বন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"চপলে, আর ফুল তুলিও না; আর মালা গাঁথিও না।"

"কেন সই?"

"আর আমি ফুলহার পরিতে পারিব না!"

"কেন, কি হইয়াছে সই?"

সাঁওতালকুমারী চপলা তাহার প্রিয়সখী হেমপ্রভার অর্দ্ধবিকসিত সুন্দর কমলকোরকনিভ মুখখানিতে একটু বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত করিয়া আবার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"কেন, কি হইয়াছে সই?"

হেম। দেখ চপলা, তাঁকে অসুখী রাখিয়া আমার এরূপে বেশবিন্যাস করা কোনমতেই শোভা পায় না। গত রাত্রিতে আমি তাঁর মনের দুঃখ বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি আমার সহিত বেশ স্বাভাবিক ভাবে হাসি তামাসা করিলেও আমি তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে একটা ঘোর বিষাদের কালিমা দেখিতে পাইলাম; তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি তাঁহার পরমারাধ্যা জননীর দুঃখরাশি আজিও দূর করিতে না পারায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত অবস্থায় দিনযাপন করিতেছেন; এবং যতদিন তিনি তাঁহার দুঃখ দূর করিতে না পারিবেন, ততদিন এমনই মর্ম্মাহত অবস্থাতেই অতিবাহিত করিবেন। তাঁকে অসুখী রাখিয়া আমি কোন্‌প্রাণে ফুলরাণী সাজিব সই? যে দিন তিনি তাঁর মার দুঃখ দূরকরিয়া সুখী হইতে পারিবেন, সেইদিন আবার আমি

মনের সাধে পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিব। যতদিন তিনি তাহা না পারিতেছেন, ততদিন আমার ব্রহ্মচারিণী ভিন্ন অন্য সাজও কিছুতেই সাজে না সই।

চপলা। দেখ সই—তোমারই দাম্পত্য প্রেম সার্থক; আর সার্থক বড়মার এতদিনের শিক্ষা। স্বামীই যে স্ত্রীর ইহসংসারের একমাত্র দেবতা, তাহা তুমিই সার বুঝিয়াছ। তোমার মতন সৌভাগ্যবতী আর কে আছে সই?

হেম। আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিতেছ? না সই—আমি সৌভাগ্যবতী নহি। এই জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইয়াছি, তাঁহাকে এতদিনেও সুখী করিতে পারিলাম না। মন্দভাগিনী আমি—শ্বশুরের স্নেহলাভের সৌভাগ্যও আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। একমাত্র শাশুড়ী—তাঁহারও চরণ দুইখানি মনের সাধে পূজা করা আমার কপালে ঘটিয়া উঠিতেছে না। আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিতেছ?

চপলা। তথাপি তুমি সৌভাগ্যবতী। তোমার ন্যায় অমন গুণবান স্বামীলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে সই? পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা ফলে তুমি অমন দেবচরিত্র স্বামী লাভ করিতে পারিয়াছ। এমন অমূল্য রত্ন পাইয়া তাহার অসদ্ব্যবহার করিও না। স্বামীপদে অচলা ভক্তি রাখিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তাঁহার জীবনের শান্তিস্বরূপিণী হইতে চেষ্টা করিও। ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য জগতে আছে কিনা জানি না। কেমন, কথাগুলি মনে থাকিবে ত'?

হেম। মনে থাকিবে না? তোমার কথাগুলি আমি বেদবাক্যেরন্যায় মনে রাখিয়া সতত তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। আর আমাকে যখন উনি বাসায় লইয়া যাইবেন, তখন তুমি আমায় ভুলিয়া যাইবে না সই?

চপলা হেমপ্রভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল,—"তোমায় আমি ভুলিয়া যাইব সই ? তাহাও কি সম্ভব ? তোমাকে না দেখিলে যে আমি একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারি না। তুমি যদি এ দুঃখিনীর বাড়ীতে আসিতে ঘৃণা কর, তবে আমিই দুবেলা যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রমীলাসুন্দরীর মা কন্যা জামাতার গৃহ ত্যাগ করিয়া কাশীবাসের জন্য লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে কাশী দর্শনের সৌভাগ্য ছিল না; তাই পথ মধ্যেই দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় বর্ণনাতীত ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া আবার কন্যাভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে বীরেশ্বর জুয়ার খেলায় ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্ব হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কুৎসিৎ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইল। তাহার চরিত্রদোষের কথা জানিতে পারিয়া আপিসের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। অবস্থা এমন হইল যে দিন আর কিছুতেই চলে না। প্রমীলাসুন্দরী এতদিন বড় দুঃখে ও বড় কষ্টে সংসার চালাইয়া আসিতে ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনিও সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন— দিন আর কিছুতেই যাইতেছিল না। একে এই ভীষণ দারিদ্র্য, তাহার উপর বীরেশ্বর নানারূপ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল—ভীষণ

বাতব্যাধিতে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইল; অর্থাভাবে চিকিৎসা করানও অসম্ভব হইয়া পড়িল। প্রমীলাসুন্দরী পূর্ব্বে বীরেশ্বরের হিংসাদ্বেষপরায়ণা গরবিণী ভার্য্যা থাকিলেও এতদিনে সংসারের বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া অনেকটা মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই সংসারের অনাবশ্যকীয় জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, এমন কি নিজেরা অনেকদিন অনাহারে পর্য্যন্ত থাকিয়া বীরেশ্বরের সাধ্যমত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবার নহে; কর্ম্মফল মানবকে ভোগ করিতেই হয়। আজীবনের সঞ্চিত পাপরাশির প্রতিফল এক্ষণে বীরেশ্বরকে পাইতে হইল—ক্রমে তাহার রোগ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল।

এতদিন যাহারা বীরেশ্বরের প্রাণের বন্ধু ছিল, যাহাদিগকে না দেখিতে পাইলে বীরেশ্বর একদণ্ডও তিষ্টিতে পারিত না, যাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য এতদিন বীরেশ্বর জলের ন্যায় অর্থরাশি ব্যয় করিয়া আসিয়াছে; সেই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুবান্ধবদের কথা এক্ষণে তাহার মনে হইল। সে আপনার ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইয়া তাহাদের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল, কিন্তু বীরেশ্বরের এই প্রাণের বন্ধুগণ তাহার এই সঙ্কটকালে তাহার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও করিল না—দৃক্‌পাত করা আবশ্যক বোধও করিল না। বরং প্রত্যুত্তরে জনৈকা বান্ধবী তাহাকে লিখিল,—"এ কর্ম্মের যে এই ফল, তাহা কি তুমি জানিতে না? কে কাহার বন্ধু? যতদিন তোমার অর্থ ছিল, ততদিন আমরাও তোমার বন্ধু ছিলাম। এক্ষণে আমাদিগকে তোমার বন্ধু বলিয়া মনে করা ঘোর স্পর্দ্ধার ধৃষ্টতার পরিচয় নহে কি? "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" গরীবের ছেলের ঘোঁড়া রোগ কেন?"

বীরেশ্বর তাহার প্রাণাধিকা বান্ধবীর নিকট হইতে এই কঠোর প্রত্যুত্তর পাইয়া তাহার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মরণাহত হৃদয়ে যে ভীষণ বেদনা অনুভব করিল, ভাষায় তাহার কিছুমাত্র ব্যক্ত হইবার নহে। হৃদয়ভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তপ্ত অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সে সরোদনে কহিল,—"হায়! হায়! আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! ইহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব ইহাদের সুখের জন্য—প্রীতির জন্য ঢালিয়া দিয়াছি? হে অনাথনাথ পরমেশ্বর! এতদিনেও কি আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?" কিন্তু অনুতাপ করিয়া কখন কর্ম্মফলের খণ্ডন করা যায় না। দিনে দিনে বীরেশ্বরের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল।

ক্রমে সংসারের যাহাকিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল, সবই বিক্রয় হইয়া গেল; আহার করিবার কয়েকখানি বাসন এবং পরিবার কয়েকখানি কাপড় ব্যতীত অপর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। মধ্যে মধ্যে এমন হইতে লাগিল যে সেদিন কাহারও মুখে অন্ন পর্য্যন্ত উঠিত না। এমনই ভাবে বড় কষ্টে ও বড় যন্ত্রণায় তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

প্রমীলাসুন্দরী তাহার মার ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন; সংসারের দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করা ভিন্ন তাঁহার উপস্থিতিতে আর অন্য কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছিল না। বৃদ্ধা অহঃরহঃ কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই দিনপাত করিতেন; বীরেশ্বরের রোগে একটু শুশ্রূষা বা যত্ন করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। যেদিন হইতে তিনি প্রমীলাসুন্দরীকে একাকিনী ত্যাগ করিয়া কাশীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে প্রমীলার মার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা দারুণ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে অসহ্য হওয়ায় একদিন প্রমীলা স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি

এখন অনর্থক এখানে থাকিয়া নিজেও কষ্ট পাইতেছেন, আমাদেরও কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন। আপনার এখন অন্য কোন আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।" কিন্তু বৃদ্ধা সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না।

এদিকে দেনার দায়ে বীরেশ্বরের বাড়ী ঘর সমস্ত নিলাম হইয়া গিয়াছিল। বাটীর নূতন মালিক আসিয়া এই মর্ম্মে নোটীস দিয়া গেল যে উক্ত বাটী অপর জনৈক ভদ্রলোকের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে উহা খালি করিয়া দিতে হইবে। বীরেশ্বর ভীষণ বাতরোগে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে—উত্থানশক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। তথাপি মর্ম্মান্তিক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া গৃহস্বামীর অনেক অনুনয় বিনয় করিল; শেষে তাহার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া আর এক সপ্তাহের সময় চাহিল। কিন্তু সে ব্যক্তির হৃদয় বুঝি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন ছিল; সে বীরেশ্বরের কাতর অনুরোধে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; বরং মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিবার মত আরও কতকগুলি কর্কশ কথা শুনাইয়া, তাহার আদেশের অন্যথা হইবে না জানাইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বীরেশ্বর কপালে করাঘাত করিয়া সেই নিদাঘ তাপদগ্ধ উত্তপ্ত আকাশতলে বসিয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ীওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল; এবার সে ব্যক্তি সঙ্গে কয়জন কনেষ্টবলও লইয়া আসিয়াছিল। আসিয়াই সে যখন দেখিল যে তখনও বীরেশ্বর গৃহ খালি করিয়া দেয় নাই, তখন সে ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বীরেশ্বরকে বলিয়া পাঠাইল,—"এখনই আপনাদিগকে বাড়ী খালি করিয়া দিতে হইবে, আমি তালাচাবি বন্ধ করিয়া যাইব।" এই ভীষণ আদেশ শুনিয়া যন্ত্রণাক্লিষ্ট বীরেশ্বরের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল; অনেক কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করিয়া বুকভাঙ্গা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাতর নয়নে প্রমীলারদিকে দৃষ্টিপাত করিল। বুদ্ধিমতী প্রমীলা স্বামীর সে কাতর দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরচারিণী মহিলা হইয়া, আজি তিনি লজ্জা, ঘৃণা, মান, সম্ভ্রম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহস্বামীর পদপ্রান্তে যাইয়া পতিত হইলেন; রোদন করিতে করিতে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন,—"দোহাই আপনার, আর এক সপ্তাহ মাত্র সময় দিন। আমি অসহায়া স্ত্রীলোক—স্বামী আমার ভীষণ রোগযন্ত্রণায় মরণোন্মুখ। আমি একাকিনী নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইব? দোহাই ধর্ম্মের—আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না। আমার স্বামীর ভীষণ রোগযন্ত্রণার কথা মনে করিয়া আমাদের প্রতি দয়া করুন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।" প্রমীলাসুন্দরীর সে কাতর অনুরোধ শুনিলে হিমালয়ের

পাষাণও বুঝি গলিয়া যাইত; কিন্তু সে বাড়ীওয়ালায় হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। সে ব্যক্তি তীব্র বিদ্রূপের স্বরে কহিল,—"আমি দাতাকর্ণ সাজিবার জন্য টাকা দিয়া বাড়ী কিনি নাই। আপনার স্বামী কাতর বলিয়া আমি কেন লোকসান সহিতে যাইব? যখন হাতে এক কপর্দ্দকও নাই, তখন আর পাকা বাড়ীতে থাকিবার দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? সোজারাস্তা দেখিলেই ত সব গোল চুকিয়া চায়।" বাড়ীওয়ালার এই নিষ্ঠুর বাক্যগুলি কাটাঘায়ে নুনের ছিটেরমত প্রমীলাসুন্দরীর হৃদয়ে মর্ম্মন্তুদ যতনা প্রদান করিলেও তিনি স্বামীর দুরবস্থার কথা মনে করিয়া আবার তাহার নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন; বলিলেন— "দোহাই আপনার, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আজ যদি আপনার স্ত্রী পুত্রের এমনই দশা হইত, তবে কেমন করিয়া আপনি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিতেন?" বাড়ীওয়ালা প্রমীলার বাক্যে বাধা দিয়া কহিল,—"কি, আমার স্ত্রীপুত্রের এমনই দশা হইবে! তোমার যতবড় মুখনয়, তত বড় কথা! বেরোও তোমরা এখনই আমার বাড়ীথেকে।" নিকটবর্ত্তী একজন সিপাহী তাহারই ইঙ্গিতানুসারে প্রমীলাসুন্দরীকে ধাক্কাদিয়া সে স্থান হইতে হটাইয়া দিল। প্রমীলাসুন্দরী সতর্ক ছিলেন না; সিপাহীর বিষম ধাক্কায় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাঁহার ললাটের কিয়দংশ কাটিয়া গিয়া রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। দূর হইতে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বীরেশ্বর এই শোচনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। প্রত্যক্ষ করিতেই তাহার শরীরের প্রত্যেক রক্তকণা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবার সুপ্তসিংহ যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল; অসাধারণ উত্তেজনাবশে সহসা বীরেশ্বর শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী একখণ্ড বংশদণ্ড লইয়া সবেগে প্রাঙ্গনের দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু নিরতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ সেই মুহূর্ত্তেই পড়িয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে

সংজ্ঞাহীন হইল। প্রমীলাসুন্দরী নিজের আঘাতের কথা বিস্মৃত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া স্বামীকে কোলে উঠাইয়া লইলেন, এবং তাহার মস্তক ও মুখে চোখে শীতলজল সেচন করিয়া তাহার মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—বীরেশ্বরের মূর্চ্ছা কিছুতেই ভাঙ্গিল না।

কিন্তু এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াও বাড়ীওয়ালার হৃদয়ে একটু মাত্রও কারুণ্যের হিল্লোল বহিল না; সে এমন অবস্থাতেও প্রমীলাসুন্দরীকে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। প্রমীলাসুন্দরী অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। সামান্য জিনিষ পত্রের সহিত স্বামীর মূর্চ্ছিতদেহ লইয়া তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বাসগৃহ জন্মেরশোধ পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ এক্ষণে তপোবনের পুণ্যাশ্রমে নিজের জন্য স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছেন, এবং প্রায় মাসাধিক হইল আপনার পরমারাধ্যা জননী ও প্রাণাধিকা পত্নীকে তথায় লইয়া গিয়া আপনার বহুকালের হৃদয়ের আক্ষেপ দূর করিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় দেড়প্রহরের সময় প্রবোধ আপনার নিয়মিত পাঠ সমাপন করিয়া পাঠাগার হইতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,

হেমপ্রভা প্রভাতে মুদ্রিতা কুমুদিনীর ন্যায় পালঙ্কোপরি নিদ্রিতা রহিয়াছেন। জানিনা কোন্ সুখের স্বপ্নে তাঁহার রক্তকুসুমতুল্য বিম্বাধরে স্বর্গীয় হাস্যের রেখা প্রস্ফুটিত হইতেছে। তাঁহার গৌরবর্ণ কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া একগাছি পুষ্পহার অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। শরীরে গহনার লেশমাত্র নাই; কেবল মৃণালহস্তে দুইগাছি শঙ্খবলয় প্রভাবিস্তার করিতেছে, এবং ললাটে সুন্দর সিন্দুরবিন্দু বিষ্ণুবক্ষস্থিত স্যমন্তকের ন্যায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া সধবার অতুল গৌরব প্রকাশ করিতেছে। কুঞ্চিত কুন্তলরাশি বায়ুবিক্ষিপ্ত মেঘমালার ন্যায় অসংযতরূপে তাঁহার শিরোদেশে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে; যেন শরতের পূর্ণশশধর বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া, মস্তকে শীতল মেঘমালা লইয়া প্রভাতে নীলাম্বরগাত্রে ঘুমঘোরে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রবোধ আজি তাঁহার কিশোরীপত্নীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন—চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া হেমপ্রভার অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"জগতের সকল সৌন্দর্য্যখনি খুদিয়া বুঝিবা বিধাতা সুনিপুণ তুলিকায় এ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যসমষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেন আমি শুধু অনাদর করিবার জন্য—ব্রহ্মচারিণী সাজাইবার জন্য এ মধুময়ীকে আপন গৃহে আনিয়াছিলাম? এ সুন্দর বন্যকুসুম বনেই ফুটিয়া বনেই শুকাইয়া গেল; কেহ ইহা দেখিল না, কেহ ইহার আদর করিল না।" এমন সময়ে হেমপ্রভা প্রবোধের পদশব্দে জাগরিতা হইলেন, এবং অদূরে স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া ত্রস্তে বসনাদি সংযত করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিলেন। প্রবোধ ধীরে ধীরে হেমপ্রভার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মমতাময় মধুরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"প্রভা!" প্রভা ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"কি প্রাণাধিক?"

প্রবোধ। দেখ প্রভা, আমি বুঝি তোমাকে বিবাহ করিয়া ভালকাজ করি নাই। কেন আমি শুধু তোমাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইবার জন্য আপন গৃহে আনিয়াছিলাম? তোমাকে ত আমি একটী দিনের তরেও সুখী করিতে পারিলাম না।

প্রভা। ছি নাথ, ওকথা কি বলিতে আছে? আমারমত সুখী—আমারমত সৌভাগ্যবতী এ পৃথিবীতে আর কয়জন আছে? বহুপুণ্যফলে—বহু তপস্যাফলে আমি তোমারমত স্বামী লাভ করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল না থাকিলে তোমার মত অসাধারণ মাতৃভক্তের সহধর্ম্মিণী হওয়া কাহারও ভাগ্যে সম্ভবপর নহে। আমার এ অসাধারণ সুখের—আমার এ অসাধারণ সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়?

প্রবোধ। আমাকে মাতৃভক্ত বলিতেছ? না প্রভা, আমি মাতৃভক্ত নহি। স্নেহময়ী মাকে আমারত একটী দিনের তরেও সুখী করিতে পারিলাম না। হতভাগ্য আমি, যেদিন হইতে তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে কেবল অনন্ত দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিধির বিড়ম্বনায় শৈশব হইতেই আমি পিতৃহীন। পিতৃবিয়োগের পর মা যে আমাকে কিরূপ দুঃখে ও কিরূপ কষ্টে মানুষ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ আমি—আমি এক্ষণে বড় হইয়া মানুষ হইয়া আমার সেই দেবী সদৃশী স্নেহময়ী জননীর দুঃখরাশি এতদিনেও দূর করিতে পারিলাম না। আমার ন্যায় পাষণ্ড আর কে আছে প্রভা?

প্রভা। না প্রাণাধিক, তুমি মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ। মা আর এক্ষণে কিছুমাত্র অসুখী নহেন। কেবল ঐশ্বর্য্য থাকিলেই কি সুখী হওয়া যায়? সুখ মানুষের মনে। যাঁহার মন ভাল, তিনি কোন অবস্থাতেই

অসুখী হয়েন না। তুমি মাকে অসুখী বলিতেছ? আমারত মনে হয়, তাঁহার মনে আর এক্ষণে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। আমি যতদূর সাধ্য, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবাশুশ্রূষার ত্রুটী করিতেছি না। তিনিও এক্ষণে সংসারের সমুদয় ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং পরকালের চিন্তায় অবহিত হইয়াছেন। মনে হয়, তিনি এক্ষণে ঈশ্বর চিন্তায় পরম শান্তিতেই দিনাতিপাত করিতেছেন।

প্রবোধ। তুমি যদি মাকে সুখী করিতে পার, তবে যে তুমি আমার কতদূর প্রিয়কার্য্য করিবে, তাহা আমি মুখে বলিয়া বুঝাইতে অক্ষম। জীবন দিয়াও আমি মাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিব; আর যে আমার এই মহৎ কার্য্যের সহায় হইবে, আপনার বুকের রক্ত দিয়াও তাহাকে আমি সুখী করিব।

প্রভা। তুমি সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। আমি প্রাণ থাকিতে মাকে কখন অসুখী হইতে দিব না। আমি তাঁহার সেবা করিয়া যে কিরূপ অসাধারণ আনন্দলাভ করি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। তুমি যে আমাকে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার অধিকার দিয়াছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মাও আমাকে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার মত অমায়িক স্নেহ এ জীবনে আর পাই নাই; পরজীবনেও পাইব কিনা জানি না। আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী আর কে আছে প্রাণাধিক?

প্রবোধ। প্রভা! সত্যই তোমার গুণের তুলনা নাই। মূর্খ আমি—আমি এতদিনেও তোমার আদর করিতে শিখি নাই। সত্যই তুমি আমার মরুদগ্ধ হৃদয়ের শান্তি নির্ঝর স্বরূপিণী।

এই বলিয়া প্রবোধ গাঢ় প্রেমভরে হেমপ্রভার মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"মা, একটু চরণামৃত দিন"।

"তুমি ছেলে মানুষ, তোমার আবার রোজ রোজ চরণামৃত খাওয়া কেন না ?"

"না মা, আমি আপনার চরণামৃত পান না করিলে বাঁচিতে পারিব না। আপনার চরণামৃত আমার পক্ষে অমৃত তুল্য।"

"পাগ্‌লী মেয়ে আমার ; যেমন আমার পাগ্‌লা ছেলে, তেমি আমার পাগ্‌লী মেয়ে।"

ভুবনমোহিনী অপরাহ্নে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার অনতিদূরে বসিয়া কয়েকজন বিধবা ভক্তিভরে নিবিষ্টমনে তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে হেমপ্রভা যাইয়া তাঁহার নিকট চরণামৃত চাহিলেন, তাহাতেই শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূতে পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

ভুবনমোহিনী কহিলেন,—"পাগ্‌লী মেয়ে আমার ; দিনরাত্রি চরণামৃত চরণামৃত ক'রে আমাকে পাগল করে তুল্লে। প্রবোধ বুঝি এতক্ষণ স্কুল থেকে এসেছে বৌমা ; যাও, এখন একটু প্রবোধের ঘরে যাও।"

হেমপ্রভা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "মা! আপনার পায়ে এখন তেল মাখিয়া দি ?"

ভুবন। দিন রাত্রি কি শুধু আমারই সেবা করিতে থাকিবে? প্রবোধও যেমন পাগ্‌লা, দিন রাত্রি মা মা করিয়া অস্থির হয় ; তুমিও

তেমনি পাগ্‌লী, অষ্টপ্রহর আমার কাছ ছাড়া হইতে চাহনা। আমার জন্য এত পরিশ্রম করিবার কি দরকার মা? প্রবোধের একটু যত্ন করিতে হয়! আমার জন্য কিছু কর আর না কর, তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু প্রবোধের আমার অযত্ন হইতে দিও না।

প্রভা। তাঁর কাজ আমি সব করিয়া দিয়া আসিয়াছি; এখন আর আমার অন্য কোন কাজ নাই। আমি আপনার পায়ে তেল মাখিয়া দিতেছি।

ভুবন। এখন একটু প্রবোধের ঘরে থাকিলে হইত না? দিন রাত্রি কত কাজ করিবে? আমাকেত সংসারের কাজে মোটে হাত দিতেই দাও না। ফুল তোলা, শিব গড়ান, এসব পর্য্যন্ত তুমি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছ। আমাকে যে তুমি একেবারে অকর্ম্মা করিয়া ফেলিলে? শুধু রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া কি সমস্ত দিন কাটান যায়?

প্রভা। আমি থাকিতে আপনি সংসারের কাজে হাত দিতে যাইবেন কেন মা? আপনি এখন শুধু বসিয়া বসিয়া গৃহিণীপনা করিবেন, আর অবসর সময়ে ধর্ম্মপুস্তক লইয়া অতিবাহিত করিবেন।

ভুবন। তা না হয় করিলাম। কিন্তু একটী কথা শোন বউমা। সারাদিন খালি হাতেই থাক; বালা দুগাছা পরিলে কি হয় না?

প্রভা। আমি মা গহনা পরিতে ভালবাসি না। আমার শাঁখা আর লোহার বালা থাকিলেই যথেষ্ট। গহনা দিয়া আমি কি করিব?

জনৈক বিধবা। তাইত, বউমার গা যে একেবারেই খালী! ও কি বউমা, ছি! গহনা পরণা কেন? একেবারে খালি গা কি ভাল দেখায়? তোমরা এখন ছেলেমানুষ, বেশ গহনা পরিয়া ঝমর্‌ ঝমর্‌ করিয়া বেড়াইবে,

দেখিতে ভাল লাগিবে। তানা—এ আবার ছেলেমানুষি কোথা হইতে শিখেছ?

ভুবন। ও আমার পাগ্লীমেয়ে। বলে কিনা, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে জীবনে কখন গহনা পরব না; গরীবের আবার গহনা কেন?"

প্রভা। আমার লোহা আর সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হউক, তাহা হইলেই আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব, এর বাড়া গহনা স্ত্রীলোকের আর দ্বিতীয় নাই।

২য় বিধবা। তা কথা মিছে নয়। দেখ প্রবোধের মা! তুমি সত্যই পরম ভাগ্যবতী। তোমার যেমন সুবোধ ছেলে, তেমনই লক্ষ্মী বউ হয়েছে। আজকালকার দিনে এমন বউ ছেলে পাওয়া বড় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তোমার গর্ভধারণ করা সার্থক হয়েছে।

ভুবন। তা কি আর বল্‌তে? এমন লক্ষ্মী বউ কারুর হয় না। সত্যই বলেছ, আমি পরম ভাগ্যবতী।

হেমপ্রভা শ্বাশুড়ীর পায়ে তেল দিতে দিতে কহিলেন,—"কি ছাই মিছে বক্‌ছেন, আপনি রামায়ণ পড়ুন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"আমার মাথা খাও সই, এই মালাটী তোমায় পরিতেই হইবে।"

"না সই, ও মালাটী তুমি পর ; আমার যা আছে তাই ঢের।"

আজি চপলা তাহার প্রিয়সখী হেমপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। দুই জনে গৃহের বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ; জ্যোৎস্না তেমন উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বড় মধুর। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে শীতল চন্দ্রালোক আসিয়া সমুদয় গৃহ ভরিয়া গিয়াছিল। হেমপ্রভা অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও আভরণ বিহীনা। তবে সে নিরাভরণ দেহে তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি যেন আরও উথলিয়া উঠিতেছিল। অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে ; পরিধানের প্রশস্ত লালপেড়ে শাড়ীখানি মেঘের কোলে বিজলীর মত অঙ্গে অপূর্ব্বশ্রী ধরিয়াছে। বক্ষ, বাহু ও ললাট চন্দন চর্চ্চিত। আর একছড়া যুঁই ফুলের হার গলদেশে শোভিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত প্রভার অঙ্গে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন আভরণ ছিল না।

চপলা হাসিয়া বলিল,—"বোকা মেয়ে কোথাকার ; গহনা পরিবে না, ফুল পরিবে না, চুল বাঁধিবে না, তবে তোমার সে সুন্দর প্রেমিকটীকে বাঁধিবে কি প্রকারে ?

হেম। ছি সই ! গহনা পরিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে হইবে ? আমি তেমন করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চাহি না। যদি

তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবেই ত এজীবন সার্থক হইল; নতুবা বেশভূষা করিয়া, অভিসারিকার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার রূপজমোহ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, আমার প্রতি প্রণয়ও সঞ্চারিত হইতে পারে; কিন্তু সে প্রণয় কখন চিরস্থায়ী হইবে না—হইতে পারে না; ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহা দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যাইবে।

চপলা। আমি তোমাকে অভিসারিকার বেশধারণ করিতে বলিতেছি না। অলঙ্কার সধবার গৌরব স্বরূপ। সধবা হইয়া গহনা না পরিলে অকল্যাণ হইয়া থাকে। দেখিতে পাও না স্বয়ং মা ভগবতী তাঁহার অনন্ত রূপরাশি সত্বেও সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন?

হেম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয় যে স্বামীই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; এই অলঙ্কার যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলেই স্ত্রীজাতি সংসারে ধন্যা হইতে পারে।

চপলা। দেখ সই, তুমিই সার বুঝিয়াছিলে; বালিকা হইয়া যে তোমার পেটে এত বুদ্ধি আছে, তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত জানিতাম না। সার্থক বড় মা তোমায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আমরাও চপলার সহিত সমস্বরে বলি, "হাঁ—এই শিক্ষাই স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ইহার বাড়া শিক্ষা তাহাদের আর নাই। যে সকল পাষণ্ড এই সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিলোপ সাধন করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের বীভৎস আদর্শ আমদানী করিতে যাইয়া আমাদের সমাজে ঘোর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে কসাঘাত করিবার উপযুক্ত বেত্রখণ্ড আমরা বাঙ্গালা ভাষার বেতসকুঞ্জ খুঁজিয়া পাই না। তাহারা আমাদের জাতির শত্রু, সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু; ভগবান তাহাদের প্রতি কৃপা করুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বীরেশ্বর সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তাহার সে মূর্চ্ছা আর ইহজন্মে ভাঙ্গিল না। প্রমীলাসুন্দরী স্বামীর মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু প্রাক্তনের গতি কাহার সাধ্য রোধ করিতে পারে? বীরেশ্বরের মূর্চ্ছা কিছুতেই ভাঙ্গিল না।

দেখিতে দেখিতে কাল বিভাবরী আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার মস্তকেও যেন বজ্রপাত হইল। এতক্ষণ তিনি দিবসের আলোকে মুমূর্ষু স্বামীকে লইয়া কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে—এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে, নিঃসহায়া তিনি কেমন করিয়া সেই বৃক্ষতলে অতিবাহিত করিবেন? অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল; মর্ম্মচ্ছেদকর উষ্ণশ্বাসে দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। বুঝি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিলে হৃদয়ের সে বিষের জ্বালার একটু নিবৃত্তি হইত; কিন্তু তিনি কুলবধূ—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল, সমস্ত রজনী প্রমীলাসুন্দরী মুমূর্ষু স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে রাত্রি যতই অধিক হইতেছিল, বীরেশ্বরের জীবনগ্রন্থিও ততই টুটিয়া আসিতেছিল। ক্রমে সে কালবিভাবরী অতীত হইল। তারপর যখন পূর্ব্বাকাশে ঊষার অরুণচ্ছটা প্রকাশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অতুল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল, ঠিক সেই সময়ে বীরেশ্বর বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে

আপনার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া জীবনের অন্তিম শ্বাস পরিত্যাগ করিল।

তখন মা ও কন্যা—প্রমীলা এবং তাঁহার মাতা মোক্ষদা দেবী—ধুলায় লুটালুটী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মোক্ষদা দেবী পূর্ব্বে যতই কঠোর হৃদয়া হউন না কেন, আজি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর প্রমীলা? প্রমীলার সেদিনের অবস্থা দেখিলে বুঝি হিমালয়ের পাষাণও গলিয়া যাইত। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ধুলায় পড়িয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কঠিন কঙ্করে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু প্রমীলার তখন সে দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ ছিল না—বুঝি তাঁহার শরীর জ্ঞান সম্পুর্ণরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। বহুক্ষণ এই ভাবে বাণবিদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছটফট্ করিয়া করিয়া যেমন তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, অমনি স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা তাঁহার মনে হইল। তখন তীব্র অনুতাপানলে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন; ভাবিলেন, হায় হায়! কি করিতেছি! এমন হইয়া বসিয়া থাকিয়া কি তাঁহার আত্মার অগতি করিব?

তাঁহাদের অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব দাসী চাকর সকলেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের বৃদ্ধা পরিচারিকা এখনও পর্য্যন্ত মনীবের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া যাইতেছে; প্রভুপত্নীর সঙ্গে সঙ্গে সেও সমস্ত রজনী বিনিদ্রভাবে বীরেশ্বরের মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া অতিবাহিত করিয়াছে। বুঝি সাধ্য থাকিলে বৃদ্ধা বীরেশ্বরকে যমের হাত হইতে কাড়িয়া লইত। প্রভুপত্নীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইল; এবং এই ঘোর আপৎকালে যথার্থ বন্ধুর ন্যায় প্রমীলাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিল।

প্রমীলার উপদেশে বৃদ্ধা যাইয়া প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা বীরেশ্বরের শবদেহ লইয়া গিয়া যথারীতি সৎকার করিল; এজন্ত আবশুকীয় দ্রব্যাদি তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া লইল। বলাবাহুল্য প্রমীলাসুন্দরীর হাতে তখন একটী কপর্দ্দকও ছিল না।

যথা সময়ে প্রমীলা তাঁহার ইহসংসারের একমাত্র অবলম্বন স্বামীদেবতাকে জন্মেরমত শ্মশানসৈকতে বিসর্জ্জনদিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ইতি পূর্ব্বেই ত' তাঁহারা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু বৃক্ষতলে থাকিলেও আহার ত' বন্ধ হইবে না; ফলে প্রমীলাসুন্দরী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

এই বড় বিপদের সময় বৃদ্ধা পরিচারিকা তাঁহার বড় উপকার করিল; প্রমীলাসুন্দরীকে সে স্নেহের সহিত বলিল,—"মা! তোমাদের কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না। যেমনই হউক, আমার একখানা কুঁড়েঘর আছে; তোমরা এখন সেই খানেই চল। আমার যদি একমুঠা খুদ কুঁড়া জুটে, তবে তোমাদেরও অবশুই জুটিবে। চিরকালটা তোমাদের নুন খাইয়াছি; এখন অসময়ে তোমাদিগকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া আমি কেমন করিয়া যাইব?" প্রমীলাসুন্দরী বৃদ্ধার এই প্রস্তাবে যেন অকূল সংসার সমুদ্রে কূল পাইলেন, এবং বলাবাহুল্য তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আপনার জননীসহ তাহার কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "মা—তোমার কি আপনার জন আর কেহ নাই?" প্রমীলাসুন্দরী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আপনার জন থাকিলে আর এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?" তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"একেবারেই যে নাই, তাহাও নহে; তবে চিরকাল তাহার সঙ্গে অসৎব্যবহারই করিয়া আসিয়াছি। আজি আর কোন্ মুখ

লইয়া তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিব?" বৃদ্ধা প্রমীলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কি করিবে মা, অসময়ে সবই করিতে হয়; ইচ্ছা করিলেই পরকে আপন করিয়া লওয়া যায়। তিনি তোমার কে হন মা?

প্রমীলা। আমার ভাগিনা। কিন্তু কোথায় থাকে, কি করে তাহা ত' জানি না। এতদিন একটী দিনের জন্যেও তাহাদের সংবাদ লওয়া হয় নাই। আমি কোন্ মুখ লইয়া এখন তাহার কাছে উপস্থিত হইব? তার চেয়ে আমি তোমার এখানেই বেশ থাকিব; না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাই, তবু এই খানেই থাকিব।

বৃদ্ধা। আমার এখানে থাক, সেটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু মিছামিছি কেন কষ্ট ভোগ করিবে মা? ভাগিনা ত' পর নয়; তাহাকেই চিঠি লিখিয়া দেখ। অবশ্যই আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।

প্রমীলা। কোথায় চিঠি লিখিব? তাঁহার ঠিকানা ত' জানি না?

বৃদ্ধা। তোমাদের গ্রামের ঠিকানা জান না?

প্রমীলা। তা জানি।

বৃদ্ধা। সেই খানেই চিঠি লিখিয়া দেখ। অবশ্যই একটা কুলকিনারা হইবে।

প্রমীলাসুন্দরী বৃদ্ধার পরামর্শ অনুসারে তাঁহার নিজের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া প্রবোধের নিকট পত্র লিখিলেন। যথা সময়ে পত্র ডাকে রওনা হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ অন্যান্যদিনের ন্যায় নিয়মিত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আজিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠাগার হইতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন হেমপ্রভা তখনও শয়ন করিতে আইসেন নাই। তিনি হেমপ্রভার প্রতীক্ষায় নিদ্রিত হইলেন না; বিছানায় শুইয়া শুইয়া একখানা মাসিকপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমপ্রভা সলজ্জ-ধীর-পদবিক্ষেপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবোধ দেখিলেন, অন্যান্য দিনের অপেক্ষা হেমপ্রভার সৌন্দর্য্য আজি অধিকতর স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার বেশভূষা পূর্ব্বের ন্যায়; অঙ্গে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই; কেবল সধবার চিহ্নস্বরূপ মৃণাল হস্তে দুইগাছি শঙ্খ বলয় ও একগাছি লোহার বালা শোভা পাইতেছে। গলায় একগাছি জুঁই ফুলের মালা, এবং ললাট সুগন্ধি চন্দন চর্চ্চিত। প্রবোধ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হেমপ্রভার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হেমপ্রভা তাঁহার সুন্দর অধরে মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি দেখিতেছ অমন করিয়া? আমার রূপ?" প্রবোধ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কতকটা তাই বটে; আজ যেন তোমাকে অধিকতর সুন্দরী বলিয়া বোধ হইতেছে। যাক্ সে কথা। আজ তোমার আসিতে এত দেরী হইল কেন?"

প্রভা। মার পায়ে তেল মাখিয়া দিতে ছিলাম। সমস্ত দিনের দারুণ গ্রীষ্মের পর এক্ষণে একটু ঠাণ্ডা বাতাস উঠায় তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাঁচা ঘুমে তাঁহাকে জাগাইয়া তুলা আমি কর্ত্তব্য মনে করি নাই; আবার গৃহের দরজা খোলা রাখিয়াও আসিতে পারি না। কাজেই বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলাম। এতক্ষণে তিনি জাগিয়া উঠিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রবোধ। তা বেশ করিয়াছ।

প্রভা। আজি তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? কোন অসুখ করিয়াছে কি?

প্রবোধ। না, অসুখ করে নাই। তবে গত রাত্রে বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম, মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মামীমা আমার উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতেছেন।

প্রভা। স্বপ্ন অনেক সময়েই মিথ্যা হইয়া থাকে; সেজন্য মন খারাপ করা উচিত নয়। আর তোমার সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার কি হইল প্রাণাধিক?

প্রবোধ। বুঝি আমার সে মনের সাধ মনেই থাকিয়া যাইবে; বুঝি তাহা কখন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না। আমার প্রতি ঈশ্বরের কি অভিসাপ আছে জানি না; আজন্মের তীব্র দারিদ্র্যত আজিও দূর হইল না। আমার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে ক্ষমতাশালী দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বসাধারণকে তাহা বিনামূল্যে বিতরণের কল্পনা আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে হয়।

প্রভা। সরস্বতীর বরপুত্রগণ কখন লক্ষ্মীর কৃপালাভে সক্ষম হয়েন না; না হওয়াই উচিত। ঐশ্বর্য্যের মোহে অতবড় পণ্ডিতকেও নরকের পথে পদার্পণ করিতে হয়; সুতরাং যিনি ভারতীর আরাধনায় নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ কামনা না করাই সঙ্গত। তুমি জন্ম দরিদ্র বলিয়া আক্ষেপ করিও না। দরিদ্রের ঘরেই প্রতিভা ও মহত্ত্বের জন্ম। ঐশ্বর্য্য কেবল নরকের পথ প্রশস্ত করে মাত্র।

প্রবোধ। তোমার কথাগুলি বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে। এমন উচ্চাঙ্গের কথা ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও শুনি নাই।

প্রভা। তুমি স্বামী হইয়া অমন করিয়া আমার স্তুতিবাদ করিও না—অকল্যাণ হইবে। সে কথা যাক্। তোমাকে যেমন করিয়া হউক, তোমার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে।

প্রবোধ। উপায় বলিয়া দাও।

প্রভা। ভিক্ষা।

প্রবোধ। ভিক্ষা! এত ভিক্ষা জুটিবে কি?

প্রভা। কেন, এই এতবড় ভারতবর্ষ, কত বড় বড় জমীদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতির লীলাভূমি। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে—একমুষ্টি করিয়া ভিক্ষা দিলে তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইবে না কি?

প্রবোধ। হায় প্রভা! বুদ্ধিমতী হইয়া এমন কথাটা বলিলে? এই অগণিত রাজা মহারাজা ও জমীদার প্রভৃতির যদি মনুষ্যত্বই থাকিবে, তবে ভারতবর্ষের আজি এদুর্দ্দশা হইবে কেন? লক্ষ লক্ষ—কোটী কোটী ভারতবাসী প্রতিবৎসর অর্দ্ধাহারে, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে; সমগ্রদেশ মহামারীতে উৎসন্ন যাইতেছে; কিন্তু এই সকল রাজা মহারাজা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ পাপ বিলাসিতার জন্য ইহারা জলের ন্যায় অর্থরাশি ব্যয় করিতেছেন। দেশের দুর্ভাগ্য নহে কি? প্রজার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া যে ভাবে তাহা পাপ ব্যসনে ব্যয়িত হয়; যে ভাবে জলের ন্যায় অর্থরাশি শ্যাম্পেনে, শীকারে, ঘোড়দৌড়ে, মোটরে, আস্তাবলের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর ভগিনী প্রভৃতির লালনে পালনে ও ইউরোপ দর্শনে ব্যয়িত হয়, তাহা ভাবিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। অথচ সমগ্রদেশ দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কোন্ দেশের লোক এত দরিদ্র? কোন্ দেশে দুর্ভিক্ষ লোকের আজন্ম সহচর? কোন্ দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর পেটের জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে? কোন্ দেশে মহামারী এমন করিয়া দেশ উৎসন্ন করে? হায় ইহারা যদি মানুষ হইত!

প্রভা। বুঝিলাম, রাজা মহারাজার কাছে ভিক্ষা পাইবে না। কিন্তু সকলেই ত' রাজা মহারাজ নহে; সকলেই ত' মনুষ্যত্বহীনও নহে। দরিদ্রের নিকট ভিক্ষা চাও; দরিদ্র ধূলিমুষ্টি দান করিলেও তাহা রত্নমুষ্টির ন্যায় মাথাপাতিয়া লও; তাহাতেই তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইবে; তাহাদ্বারাই তোমার মহৎ সংকল্প সিদ্ধ হইবে। পৃথিবীতে যতকিছু মহৎ কার্য্য হয়; তাহার অধিকাংশই দরিদ্রের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অভিজাতকুল কেবল দেশের কলঙ্ক স্বরূপ।

প্রবোধ। তবে তাহাই হউক, তোমার পরামর্শ ই গ্রহণ করিলাম।

দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল; অবশেষে প্রবোধ বলিলেন,—"রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, এখন নিদ্রিত হওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা অসুখ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" তখন দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সবেমাত্র প্রবোধ স্কুল হইতে বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময়ে ডাকঘরের হরকরা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িয়া দেখিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল;—

"পরম কল্যাণবরেষু।—

প্রবোধ! বহুদিন তোমাদের সংবাদ লই নাই; সেজন্য ঈশ্বরের অনন্ত অভিসাপ আমার প্রতি বর্ষিত হইবে জানি। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চিরকাল অনুশোচনা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

সম্প্রতি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তোমার দেবতুল্য মাতুল মহাশয় সকলকে কাঁদাইয়া, আমাকে অনাথা করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমি পথের কাঙ্গালিনী অপেক্ষাও অধম হইয়াছি। বৃক্ষতল ভিন্ন এজগতে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই।

এই বিস্তীর্ণ সংসারে এক্ষণে যদি আমার আপনার বলিতে কেহ থাকে, তবে সে একমাত্র তুমি। কিন্তু তোমাকে কোন অনুরোধ করিবার মুখ আমি রাখি নাই। তবে যদ্যপি দয়া করিয়া এ অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে কর, তবে পত্র পাঠ এখানে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবে। নিজের অবস্থার কথা লিখিতে গেলে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া আইসে, তাই সবিস্তারে কিছু লিখিতে পারিলাম না; তবে এটুকু নিশ্চয় জানিবে যে পথের দীনহীনা কাঙ্গালিনী অপেক্ষাও আমি এক্ষণে অধম হইয়াছি;— কি করিব, ইহাই আমার ললাট লিপি।

নিত্য আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মামীমাতা।"

প্রবোধ এই অচিন্তিতপূর্ব্ব পত্র পাইয়া—তাঁহার মাতুল মহাশয়ের এই অকালমৃত্যু ও তাঁহার পরিবার বর্গের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা অবগত হইয়া হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে যাইয়া তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন,— "আজ এই সন্ধ্যার ট্রেণেই আমাকে মামীমার নিকট রওনা হইতে হইবে।" ভুবনমোহিনী তাঁহার সহোদরের অকাল মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিলেন। আজি আর তাঁহার পূর্ব্বকথা মনে হইল না। তিনি এমনই ভাবে পিতার বংশলোপ হইল দেখিয়া দুঃখে ও শোকে যারপর নাই অভিভুত হইয়া পড়িলেন।

প্রবোধ মাতার অনুমতি লইয়া আপন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন হেমপ্রভা পূর্ব্ব হইতেই সেস্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রভাকে সমস্ত কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মামীমাকে লইয়া আসিবার জন্য আমাকে এখনই রওনা হইতে হইবে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তিনি যে দুঃখ পাইবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না।" হেমপ্রভা মামাশ্বশুরের মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলেন, এবং প্রবোধের বাক্যে বলিলেন,—"সে কথা শতবার। তুমি তাঁহাদিগকে লইয়া আইস; আমি যথাসাধ্য তাঁহাদের যত্ন ও সেবাশুশ্রূষা করিয়া সতত তাঁহাদিগকে সুখী রাখিতে চেষ্টা করিব।" সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে প্রবোধ লক্ষ্ণৌএ রওনা হইলেন।

*　　*　　*　　*

যথাসময়ে প্রবোধ লক্ষ্ণৌ যাইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার মামীমাতার বর্ত্তমান বাসস্থান কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। সমস্ত দিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষুৎপিপায় একান্ত পীড়িত হইয়া জনৈকা বৃদ্ধাকে ধর্ম্মশালার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার শুষ্ক মুখ ও ক্লান্ত দেহ দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিল,—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ বাছা? তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি সমস্তদিন কিছু খাওনাই। আজি আমি মাকাইএর খই ভাজিয়াছি; তুমি চারিটী খই খাইয়া একটু জল খাইবে বাছা?" প্রবোধ বৃদ্ধার এই সহৃদয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; আজি সমস্ত দিন ধরিয়া তিনি কত ধনী, কত দরিদ্র, কত প্রবাসী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু কই, আরত কেহ তাঁহাকে একটীবারও খাবার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৃদ্ধা সাদরে তাঁহাকে আপনার কুটীরে লইয়া গিয়া তাহার একমাত্র সম্বল একখানি ছিন্ন কন্থায় উপবেশন করিতে দিল।

এমন সময়ে কুটীর হইতে জনৈকা মলিনবসনা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিলেন। প্রবোধ দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন যে তিনিই তাঁহার মামীমাতা। তাঁহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম সফল হইল। তিনি আপন পরিচয় দিয়া ভক্তিভরে মাতুলানীর পদধূলি মাথায় লইলেন।

একে একে প্রবোধ মাতুলানীর মুখে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সকল কথা শুনিলেন; শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। মাতুলানীকে বলিলেন, "পূর্ব্বকথা মনে করিয়া দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমার মাতৃতুল্যা। অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে চলুন; আমি আপনার চরণপূজা করিয়া ধন্য হইব।" প্রমীলাসুন্দরী প্রবোধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রবোধ তাহার মাতুলানীর বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি অসময়ে মামীমাতাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছ; কুটির বাসিনী দরিদ্রা হইয়াও যেরূপ উদারতা ও মহত্ব দেখাইয়াছ; তাহাতে তোমার ঋণ আমরা ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। তথাপি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে আমি যাহা অর্পণ করিব, তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" এই বলিয়া প্রবোধ আপনার অঙ্গুলী হইতে শ্বশুর প্রদত্ত বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ উহা প্রবোধের পদতলে রক্ষা করিয়া বলিল,—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অতি যৎসামান্য। চিরকাল যাহাদের লবণ খাইয়াছি, বিপদের সময়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ঘোর নিমকহারামের কাজ করা হইত। এজন্য আমি বক্‌শিস লইতে যাইব কেন। তোমরা এখন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিব।" কিন্তু প্রবোধ কিছুতেই ছাড়িলেন না; অনেক করিয়া বৃদ্ধাকে পুরস্কার লইতে সম্মত করিলেন।

সেইদিনই তিনি প্রমীলাসুন্দরী ও মোক্ষদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে রওনা হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে মোক্ষদাদেবী প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপু আমাদিগকে তোমার বাড়ীতে ত' লইয়া যাইতেছ; কিন্তু সেখানে আমাদিগকে রাখিতে পারিবে কি?" প্রবোধ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন দিদিমা?"

মোক্ষদা। তোমার মার যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহা আমরা জানি। তাহার হাতে যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্যই কি আমাদিগকে যাইতে হইবে?

প্রবোধ। দিদিমা, এ আপনি কি বলিতেছেন? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদিগকে যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে কেন?

মোক্ষদা। বুঝিতে পারিলে না? আমরা চিরকালই তোমার মার দু'চক্ষের বিষ। সুযোগ পাইলে বহুকাল পূর্ব্বেই সে আমাদের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় এতদিন তাহা সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে কায়দায় পাইয়া সে যে মনের সাধে আমাদের নির্য্যাতন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?

প্রবোধ। দিদিমা, আপনি বৃথা সংশয় করিতেছেন। আর আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আপনার মুখে এমন কথা শুনিতে হইল। যাহাহউক, আপনারা এরূপ বৃথা সংশয় করিবেন না। আপনারা আমার মাতৃতুল্যা; মা ও আপনাদিগকে আমি ভিন্ন চক্ষে দেখিনা। আমার মার কথা বলিতেছেন? তাঁহার দ্বারা এরূপ কার্য্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং আপনাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটী করিবেন না, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি; আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হউন।

মোক্ষদা। বাপু! তুমি না হয় বলিলে তিনি কিছু বলিবেন না; কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি কি প্রকারে? মানুষ স্বভাবতঃই

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে ভালবাসে। বিশেষতঃ তোমার মা যেরূপ ইতর প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাতে সে যে আমাদের নির্যাতনের চরম করিবে, তাহা অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। জানিয়া শুনিয়া আমরা এমন সঙ্কটময় স্থানে পা দিই কি প্রকারে?

প্রবোধ। হায়! ঈশ্বর আমাকে বধির করেন নাই কেন? আর যে মাতৃনিন্দা সহ্য করিতে পারি না।

মোক্ষদা। তা না পারিবারই কথা। আমাদিগকে কি তাহা হইলে পথিমধ্য হইতেই বিদায় দিবার সংকল্প করিলে?

প্রবোধ। আমি এমন কথা কখন বলিয়াছি কি? ঈশ্বরের স্নেহশূন্য নিরব অভিসম্পাত কি তাহা হইলে আমার উপর বর্ষিত হইবে না? দিদি মা! আবার আমি আপনাদিগের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, আপনারা বৃথা আশঙ্কা করিবেন না। মা যে আপনাদের প্রতি কোনরূপ অসংব্যবহার করিবেন না, বরং সাধ্যমত আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিবেন, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি; কেন না এরূপকার্য্য তাঁহারমত সাক্ষাৎ করুণারূপিনীর সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর আমার পত্নীও যাহাতে আপনাদেব কোনরূপ অশান্তির কারণ না হইতে পারেন, তাহার জন্য আমি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে দায়ী রহিলাম। তিনি আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবেন, ইহা স্থির নিশ্চয়; যদ্যপি না করেন, তবে আমি গুরুজনের মঙ্গল ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে পত্নীত্যাগেও কুণ্ঠিত হইব না, ইহাও স্থির নিশ্চয়।

মোক্ষদা। বাপু! তুমি যাহাই কেন বল না, তোমার আশ্বাসে কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না। যদ্যপি তুমি আমাদের জন্য একটী পৃথক বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পার, তবেই আমরা তোমার আশ্রয়ে যাইতে পারি, নতুবা নহে। কেমন এই প্রস্তাব স্বীকার কর কি?

প্রবোধ। আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে আপনাদের এ ইচ্ছাও পূর্ণ করিতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নিজেই এক্ষণে গৃহহীন; সুতরাং আপনাদের এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি আমার নাই। অতএব আমার এই অপরাধ আপনি গ্রহণ করিবেন না। দিদি মা! আবার আমি আপনাদের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে আপনারা আমার গৃহে পদার্পণ করুন; আমি আপানাদের চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইব।

মোক্ষদা। না বাপু, আমরা তাহা কিছুতেই পারিব না। তুমি আমাদিগকে মোহনপুরে পৌছাইয়া দিয়া আইস; আমরা সেখানে ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া যেরূপে হউক, প্রাণ ধারণ করিব। তোমার মার হস্তে যন্ত্রণাভোগ করা অপেক্ষা তাহাও আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

প্রবোধ। মামী মারও কি এই মত?

প্রমীলা। তোমার গৃহে যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্য নাই; কিন্তু মাযে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াই বা আমি তোমার গৃহে যাইয়া কেমন করিয়া অবস্থান করি? মা এরূপ মত করিবেন জানিলে আমি তোমাকে পত্র না লিখিলেই ভাল করিতাম।

প্রবোধ। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর সাক্ষী, ইহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি আপনাদিগকে অনুনয়, বিনয় সবই করিলাম; কিন্তু ইহাতেও যদ্যপি আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে অবশ্য আমি একান্ত নাচার।

মোক্ষদা। তুমি আমাদিগকে মোহনপুরে পৌছাইয়া দিয়া আইস; তাহারপর আমাদের অদৃষ্ট যাহা আছে, তাহাই হইবে। যে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের দিনপাতেরও ব্যবস্থা করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত।

প্রবোধ। ভগবানের ইচ্ছায় তাহাই হউক; কিন্তু আমি যেন এ মহাপাপের জন্য দয়ী না হই।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন, সকলেরই মুখে গম্ভীরতা বিরাজ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবোধ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এক্ষণে মোহনপুরে যাইয়া কোথায় অবস্থান করিবেন?" মোক্ষদাদেবী—তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"সে জন্য বাছা তোমায় বিব্রত হইতে হইবে না। আমার বোন্‌পুতের বাড়ীতে গেলে সে আমাদের পরম সমাদর করিবে।" প্রবোধ বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, তবে তাহাই হউক; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আমার কোন অপরাধ লইবেন না।" যথা সময়ে প্রবোধ মোক্ষদাদেবী ও প্রমীলাসুন্দরীকে মোহনপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বয়ং তপোবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কয়মাস পর্য্যন্ত মোক্ষদাদেবী কন্যাসহ মোহনপুরে তাঁহার আত্মীয়ের গৃহে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। তিনি বড় আশা করিয়া তাঁহার ভাগিনেয় হিতেন্দ্রকুমারের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই তিনি হিতেন্দ্র ও তাহার পত্নীর ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। হিতেন্দ্র প্রতিকার্য্যে ও প্রতিবাক্যে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যে, সে তাঁহাদের আগমনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, এবং তাঁহাদের ব্যয়ভার বহনেও প্রস্তুত নহে। এমনই ভাবে কিয়দ্দিন অতীত হইবার পর মোক্ষদাদেবী একদিন পুষ্করিণীর পিচ্ছিল ঘাট হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলেন, এবং পড়িয়া গিয়া একখানি ভগ্ন কাচখণ্ড লাগিয়া তাঁহার দক্ষিণ

পদের কয়েকস্থান কাটিয়া গেল। আঘাত তত গুরুতর না হইলেও তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে এই সামান্য আঘাতই ক্রমে তাঁহার জীবন নাশের কারণ হইল। তাঁহার সেই সামান্য ক্ষত উপেক্ষিত হওয়ায় ক্রমে উহা বিষম হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তাঁহার ভাগিনেয়কে কয়েকদিন ধরিয়া ঔষধের বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেক করিয়া অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নব্যশিক্ষিত হিতেন্দ্রকুমার, 'হইতেছে' 'হইবে' বলিয়া তাঁহার মাসীমাতার সকল অনুরোধ কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। এমনই ভাবে আরও কয়েক দিবস অতীত হইবার পর বৃদ্ধা একদিন তাঁহার ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং কিছুতেই থাকিতে না পারিয়া তাঁহার ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন। কি সর্ব্বনাশ! ক্ষতস্থানে অসংখ্য পোকা কিল্ বিল্ করিয়া বিচরণ করিতেছে। বৃদ্ধা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে এই কীট দংশনের ফলেই তিনি আজি ক্ষতস্থানে অমন অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন; এবং সেই জন্য আপনার দুর্ভাগ্য ভাবিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

প্রমীলাসুন্দরী যাইয়া মার শোচনীয় অবস্থার কথা হিতেন্দ্রকুমারকে জানাইলেন। হিতেন্দ্রকুমার শুনিয়া বলিল,—"প্রমীলা! তুমি চিন্তিত হইও না; আমি এখনই ডাক্তার ডাকিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতেছি।" প্রমীলাসুন্দরী কতকটা আশ্বস্তা হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কই? সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, তথাপি ডাক্তার আসিল কই? প্রমীলা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তখনও ডাক্তার ডাকিবার জন্য লোক পাঠান হয় নাই। তিনি হিতেন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া সমস্ত ঘটনা মার নিকট বিবৃত করিলেন। মা শুনিয়া বুকভাঙ্গা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হিতেন্ আমাকে দেখিল

না; না দেখুক, ঈশ্বর আমার ভরসা। আর আমি কোন ঔষধ আনিলেও তাহা ব্যবহার করিব না। এখন আমি একমাত্র বিপদভঞ্জন নারায়ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

এদিকে আহার করিতে বসিয়া হিতেন্দ্রকুমার হাসিহাসি মুখে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাসী ঠাক্রুণের ঘায়ে নাকি পোকা পড়েছে?" তাহার পত্নীও তেমনই হাসিমুখে উত্তর করিল, 'তাই শুনছিতো'।

হিতেন্দ্র। আমাকে আবার ডাক্তার ডাকিবার জন্য ফরমাইস হইয়াছে।

পত্নী। তা বটেই ত; আর ডাক্তার ডাকিয়া দরকার নাই। অনর্থক টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কি হইবে? ও পাপ এখন বিদায় হইলেই বাঁচা যায়।

হিতেন্দ্র। আমিও তাই মনে করিয়াই ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই নাই। যে ঘা হইয়াছে, ও আর ডাক্তারের সাধ্য নাই যে ভাল করে। অনর্থক টাকা জলে দিয়া কি হইবে?"

* * * * *

এই ভাবে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। বৃদ্ধার ক্ষতের অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু হিতেন্দ্র তাঁহার চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থাই করিল না। এদিকে প্রমীলাসুন্দরী মার আর্ত্তনাদে স্থির থাকিতে না পারিয়া একদিন কিঞ্চিৎ ফেনাইল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে বৃদ্ধার বেদনার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, যন্ত্রণা আরও সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল।

সেইদিন অপরাহ্ণে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় আসিয়া চরাচর বিক্ষুব্ধ করিল। প্রকৃতির সে হাসিমুখ কোথায় লুকাইল; ঘোর ঘনান্ধকারে আকাশ মেদিনী এক হইয়া গেল।

সোঁ সোঁ রবে বায়ু বহিল; ঘনঘন ক্ষণপ্রভা চমকিল; মুহুর্মুহু বজ্রনাদে ধরণীবক্ষ প্রকম্পিত হইল; সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। যেন বিধাতার প্রত্যক্ষরোষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ধরণীবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিল।

ঘোরা, গম্ভীরা, ভীষণা সংহাররূপিণী প্রকৃতি অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া, দিক্‌দিগন্ত ছড়াইয়া, সূচীভেদ্য নিবিড় তিমিররাশি ঢালিয়া দিয়া উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে কি মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়াছে। সে দৃশ্য কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

বাহিরে ধরণীবক্ষে প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল, আর একখানি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রমীলাসুন্দরীর বৃদ্ধা মাতার জীবনগ্রন্থি ধীরে ধীরে টুটিয়া আসিতেছিল। একাকিনী প্রমীলাসুন্দরী মুমূর্ষু মাতার শিয়রে বসিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া নিরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। হায়! এমন সময়েও নিষ্ঠুর হিতেন্দ্রকুমার বা তাহার পত্নী একবার আসিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব পর্য্যন্ত লইল না।

দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধার অন্তিম লক্ষণ সকল উপস্থিত হইল। দীপ নির্ব্বাণের আর বিলম্ব নাই দেখিয়া প্রমীলাসুন্দরী বুকভাঙ্গা গভীর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বৃদ্ধাকে টানিয়া গৃহের বাহির করিয়া তুলসী তলায় লইয়া গেলেন। আজি জন্মেরমত তিনি তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে বিদায় দিতে বসিয়াছেন; তিনি বৃদ্ধাকে তারকব্রহ্মনাম শুনাইতে ভুলিয়া গেলেন; বৃদ্ধার মুখের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"মা! মা! মা!" তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে সব ফুরাইয়া গেল; বৃদ্ধা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

* * * *

ঝড় থামিয়াছে; প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আবার মাথার উপরে চাঁদ হাসিতেছে; চাঁদের সুধাধারায় ধরণী স্নাত হইতেছে। সুবিমল জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক মধুময় করিয়াছে। জগৎ শান্ত, স্থির ও সুষমা মণ্ডিত।

কি মনোহর দৃশ্য! যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, বিমল জ্যোৎস্নাধারা প্রবাহিত। সে স্ফুট চন্দ্রালোক সহসা দিবালোক বলিয়া ভ্রম হয়। দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া সে রজত কৌমুদীরাশি বিকশিত। যেন মঙ্গলময় বিধাতার অনন্ত আশীর্ব্বাদ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া অজস্রধারে ধরাতলে বর্ষিত হইতেছে।

কিন্তু প্রকৃতির এই অনিন্দ্যসুন্দর অপূর্ব্বশোভা কেহ দেখিল না;—দেখিবার কেহ ছিল না। প্রমীলাসুন্দরী এই শোভা উপভোগ করিলে করিতে পারিতেন। কিন্তু তখন তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীর মৃতদেহের পার্শ্বে ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিলেন, অসহ্যশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছিলেন। হায়! বিধিলিপি কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গম্ভীর নিশিথিনীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রমীলাসুন্দরী-কৃত সেই গভীর আর্ত্তনাদধ্বনি হিতেন্দ্রকুমার ও তাহার পত্নীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা তামাসা দেখিবার ইচ্ছায় উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিল; দেখিল, তামাসার মত তামাসা বটে। বৃদ্ধা মরিয়া গিয়াছে দেখিয়া দুই জনেরই মনে বড় আহ্লাদ হইল; ভাবিল বুড়ি মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে; এখন আর একটা দূর হইলেই বাঁচা যায়।" হিতেন্দ্রকুমার তখন

লোকজনকে ডাকিতে পাঠাইল। প্রতিবেশীরা সংবাদ পাইবামাত্র তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন হিতেন্দ্রের পত্নী সকলকে দেখাইয়া কাঁদিতে বসিল। বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক করিয়া কাঁদিল; যেন তাহার শোকের অন্ত নাই—সীমা নাই। কিন্তু তাহার চক্ষে এক বিন্দুও জল ছিল না।

যথাসময়ে প্রমীলাসুন্দরী তাঁহার মাতৃদেবীকে পবিত্র ভাগীরথী সৈকতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন। জীবন এক্ষণে তাঁহার একান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এতদিন সংসারের দুঃখ কষ্ট সবই তিনি মার মিষ্ট কথা শুনিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি একেবারেই নিরাশ্রয় হইলেন। শোকে দুঃখে একটু সান্ত্বনা, বা একটী মিষ্ট কথা বলিবারও এজগতে তাঁহার কেহই রহিল না। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে এক্ষণে হিতেন্দ্রের হস্তে প্রতিদিন শত সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করা ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিতে লাগিল। হিতেন্দ্রের হিংসাদ্বেষপরায়ণা পরশ্রীকাতরা পত্নী প্রতিকার্য্যে ও প্রতিবাক্যে প্রমীলাসুন্দরীকে অশেষপ্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। প্রমীলা যে উড়িয়া আসিয়া তাহাদের বুকে জুড়িয়া বসিয়াছেন; তিনি যে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কৃপার উপর নির্ভর করেন; তাঁহার যে কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে না; হিতেন্দ্রের পত্নী পদে পদে এই কথা প্রমীলাসুন্দরীকে বুঝাইতে বসিত। প্রমীলাসুন্দরী সকলই নিরবে সহ্য করিতেন; আর আপনার অদৃষ্টকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিতেন,—"হায়! কেন আমি প্রবোধের কথা শুনি নাই; তাহা হইলেত আজি আমাকে এ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না! হায়, কেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল? কেন আমি স্বেচ্ছায় তাহার আদর যত্ন, ভক্তি ভালবাসা

সমস্ত পদদলিত করিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের পথ প্রশস্ত করিলাম? এত দুঃখেও কি আমার পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?"

এমনই ভাবে বড় দুঃখে প্রমীলাসুন্দরীর এক একটী দিন কাটিতে লাগিল। তিনি যে হইতে হিতেন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই হইতে প্রতিদিন দুইবেলা তাহার গৃহের সমুদয় রন্ধন কার্য্য—আমিষ ও নিরামিষ তিনিই সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। প্রথমে একবার স্নান করিয়া মাছের ঘরে রাঁধিতে যান; পরে সকলের ভোজনাদি শেষ হইলে আবার স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বয়ং যৎসামান্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। আবার রাত্রি হইতে না হইতে পুনরায় মাছের ঘরে যাইতে হয়। সেখানে সকলের আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি এত অধিক হইয়া যায় যে সে সময়ে স্নান করিলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অধিকাংশ দিন প্রমীলাসুন্দরী দারুণ পিপাসা সত্বেও একটু জলপান করিতে পাইতেন না। যে দিন নিতান্ত অসহ্য হইত, সে দিন সেই নিশীথ রাত্রেই আবার স্নান করিয়া আসিতেন; এবং শুদ্ধ একঘটি জলমাত্র পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত নিবৃত্ত করিতেন। বড় ক্ষুধা-সত্বেও কোনদিন তাঁহার ভাগ্যে একটু জলযোগ করা ঘটিয়া উঠিত না।

এমনই ভাবে অত্যধিক পরিশ্রমে প্রমীলাসুন্দরীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল—প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থা লইয়াই তিনি আরও কিছুদিন চালাইলেন; কিন্তু ক্রমেই তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতে হইতে একদিন হঠাৎ তাঁহার কম্পদিয়া প্রবল বেগে জ্বর আসিল। তিনি হিতেন্দ্রের পত্নীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আজি তাঁহার কম্পদিয়া জ্বর আসিয়াছে, তিনি আজি রাঁধিতে পারিবেন না; কিন্তু হিতেন্দ্রের পত্নী একথা বিশ্বাস করিল না;

ভাবিল,—'কেবল কাজের ভয়ে প্রমীলা অসুখের বাহানা করিতেছেন।' সুতরাং সে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল,—"আমি যে তোমাকে রাঁধিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইব, এমন আশা করিও না। যদি এ বাটীতে থাকিতে হয়, তবে প্রত্যহ যেমন রাঁধিয়া আসিতেছ তেমনই রাঁধিতে হইবে। নতুবা ভালয় ভালয় আপনার পথ আপনি দেখিয়া লও।" প্রমীলাসুন্দরী হিতেন্দ্রের গৃহে এপর্য্যন্ত অনেক দুঃখ কষ্ট—অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আজিকার এই অপমান তাঁহার একান্ত অসহনীয় হইল। ক্ষোভে ও রোষে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইলেন; এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া শরীরে সেই প্রবল জ্বর লইয়াই অসাধারণ উত্তেজনা বশে হিতেন্দ্রের গৃহ জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বল রোগিণীর পক্ষে অধিকদূর পদব্রজে গমন সম্ভবপর হইল না; কিয়দ্দূর গমন করিয়াই তিনি জনৈকা দরিদ্রার কুটীরের সম্মুখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াগেলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"প্রবোধ, অনেক দিন তোর মামীমাকে দেখিতে যাস্ নাই। কাল অমাবস্যায় ত তোর স্কুল বন্ধ, সুতরাং আজিকার রাত্রির ট্রেণে যাইয়া তাহাকে একবার দেখিয়া আয়।" প্রবোধ মার ইচ্ছা সম্পাদনে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিতেন না; আজিও তাঁহার আদেশমত মামীমাকে দেখিবার জন্য মোহনপুরে রওনা হইলেন।

যথাসময়ে প্রবোধ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া হিতেন্দ্রের গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার গৃহে পৌঁছিতে অতি অল্পমাত্র পথই অবশিষ্ট আছে, এমনই সময়ে হঠাৎ সম্মুখে রাস্তার উপরে তাঁহার মামীমাকে মূর্চ্ছিতা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

যাহাহউক প্রকৃতিস্থ হইয়াই তিনি প্রমীলাসুন্দরীকে বহন করিয়া নিকটবর্ত্তী জনৈকা দরিদ্রার কুটিরে লইয়া গেলেন, এবং স্বয়ং দৌড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ একজন চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন। চিকিৎসকের সুচিকিৎসা ও তাঁহার নিজের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার গুণে প্রমীলাসুন্দরী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। প্রবোধ তখন তাঁহাকে হিতেন্দ্রের গৃহে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে প্রমীলা তাহাতে দৃঢ়বাক্যে অসম্মতি জানাইলেন; এবং হিতেন্দ্র ও তাহার পত্নীর দুর্ব্যবহারের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন,—"প্রাণ থাকিতে আর আমি হিতেন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করিব না। মরিতে হয় আমি তোমার গৃহে যাইয়া মরিব; আমাকে এখন সেইখানেই লইয়া চল।" প্রবোধও তাঁহার সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার পক্ষে তাহাই সুবিধাজনক মনে করিলেন; এবং যথাসম্ভব সতর্কতাসহকারে প্রমীলাসুন্দরীকে তপোবনের বাসাবাটীতে লইয়া গেলেন।

এদিকে তপোবনে আসিয়াই প্রমীলাসুন্দরীর অসুখ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; প্রবল জ্বরে তিনি দিনরাত্রি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রহিতে লাগিলেন। যখনই তিনি একটু জ্ঞানলাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করেন, তখনই দেখিতে পান যে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় তাঁহার মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, ভুবনমোহিনী এমনই অক্লান্তভাবে প্রমীলাসুন্দরীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার গুণে মরণোন্মুখী প্রমীলাসুন্দরী দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যতদিন প্রমীলাসুন্দরী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হইলেন, ততদিন ভুবনমোহিনী অথবা হেমপ্রভা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে নিয়তই বসিয়া থাকিতেন। যখনই তিনি অতীত জীবনের দুঃখ-কাহিনী সমূহ স্মরণ করিয়া বিষণ্ণ হইতেন,

তখনই হেমপ্রভা সদ্‌গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশসকল পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। এমনইভাবে ভুবনমোহিনী ও হেমপ্রভার যত্ন ও সেবা শুশ্রূষায় প্রমীলাসুন্দরী অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন; এবং এতদিন পরে মনে একটু প্রকৃত শান্তিলাভেও সক্ষম হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রমীলাসুন্দরীর ঐকান্তিক আগ্রহে প্রবোধ কুমারডাঙ্গার বাটী মহাজনের গ্রাস হইতে বহু চেষ্টায় উদ্ধার করিলেন; এবং তাঁহার মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার সেই জন্মভূমিতে আর একটী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহারই অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া তপোবন বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার জনৈক সুশিক্ষিত উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

প্রমীলাসুন্দরী প্রবোধের আশ্রয়ে আসিয়া যেরূপ সুখে ও শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন, জীবনে তেমন শান্তিলাভ করা তাঁহার ভাগ্যে কখন ঘটিয়া উঠে নাই। সাধ্বী ভুবনমোহিনীর পবিত্র ও মধুর সংস্পর্শে পূর্ব্বের সেই হিংসাদ্বেষ পরায়ণা পরশ্রীকাতরা প্রমীলাসুন্দরী এক্ষণে পরম পুণ্যবতী রমণীরত্নে পরিণত হইয়াছেন। যে হৃদয় একদিন হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি ভীষণ কালকূটে সতত পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাই এক্ষণে নব বসন্তের প্রভাতকালীন নির্ম্মল আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে; শুধু নিষ্কলঙ্ক নয়, তাহা এক্ষণে স্বর্গের মন্দাকিনীর ন্যায় দয়া মায়া প্রভৃতির চির শান্তিময় অমৃত প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে।

ভুবনমোহিনী ও প্রমীলাসুন্দরীর এক্ষণে পরকালের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কাজই নাই। হেমপ্রভা নিজেই সংসারের কাজকর্ম্ম সমুদয় স্বহস্তে

সম্পন্ন করিয়া থাকেন। রাঁধা, বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া ও বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনমোহিনী ও প্রমীলাসুন্দরীর পূজার জন্য সজ, নৈবেদ্য ও শিবগড়ান ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য তিনি প্রফুল্লমুখে স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সংসারের কাজকর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই হেমপ্রভা শ্বাশুড়ী ও মামী-শ্বাশুড়ীকে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল পাঠ করিয়া শুনাইতেন; নভেল পড়িয়া সময় নষ্ট করিবার তিনি আদৌ পক্ষপাতিনী ছিলেন না।

* * * *

সংসারে এইরূপে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন রাত্রিতে হেমপ্রভা হাসিতে হাসিতে প্রবোধকে কহিলেন,—"কেমন, এখন ত তোমার মনের সমস্ত আক্ষেপ মিটিয়া গিয়াছে?" প্রবোধও তেমনই হাসিতে হাসিতে প্রভার রক্তকুসুম কান্তি সুন্দর অধরে সাদরে চুম্বন প্রদান করিয়া কহিলেন,—"হাঁ, এতদিনে আমার জীবনের সব সাধ পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শক্তিসম্পন্ন সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছে, সর্ব্বোপরি চিরদুঃখিনী মা আমার সুখের আস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমার কোন আক্ষেপ নাই; এখন হাসিতে হাসিতে দেশের জন্য যে কোন মুহুর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। আর তোমার ন্যায় কল্যানীর পবিত্র সাহচর্য্য লাভে সক্ষম হইয়াছি বলিয়াই জীবনে এতদূর কৃতকার্য্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এখন মাতৃপদে অচলা ভক্তি থাকিতে থাকিতে এ তুচ্ছ দেহ ত্যাগ করিতে পারি, দেবতার চরণে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

যথাসময়ে ভুবনমোহিনী পুত্র ও পৌত্রবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইয়া সহাস্যমুখে স্বর্গারোহণ করিলেন। প্রবোধ ও হেমপ্রভার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহার অভাবে মাতৃহীন হইল।

প্রবোধ মাতার অন্তিম বাসনানুযায়ী পবিত্র নারায়ণতীর্থে তাঁহার শবদেহ লইয়া গিয়া তথায় মহাসমারোহে উহা ভস্মীভূত করিলেন; এবং ভস্মাবশেষ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ সেইখানেই স্কন্দ ও গোবিন্দ মন্দিরের মধ্যভাগে ও অপর ভাগ করতোয়া তীরে শ্রীশ্রীভবানীপুরের মৃত্তিকায় গভীরদেশে প্রোথিত করিলেন; এবং তৃতীয় ভাগ কুমার ডাঙ্গা গ্রামে লইয়া গিয়া গৃহের অনতিদুরে একটী রক্তপ্রস্তরের মন্দির ও তন্মধ্যে একটী রত্নবেদী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহারই উপরে একটী বহুমূল্যবান কৌটার ভিতরে সুরক্ষিত করিলেন; এবং মন্দিরের দ্বারদেশে সুবৃহৎ রক্তাক্ষরে লিখিয়া দিলেন,—"মাতৃতীর্থ"। ক্রমে এই মন্দির সত্য সত্যই মাতৃতীর্থে পরিণত হইল। যাঁহারা মাতৃ আহ্বান শুনিতে পাইয়া মাতৃ পূজার মন্ত্র গ্রহণ করিতেন, এই স্থানেই তাঁহারা আসিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে দেখিতে দেখিতে কুমারডাঙ্গা গ্রাম মাতৃসেবার এক পরম পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হইল, এবং এই স্থান হইতে দলে দলে সাধকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের বিরাট মুক্তিযজ্ঞে অবতীর্ণ হইতে লাগিল।

আমরাও মাতৃতীর্থ সমাপ্ত করিলাম। আশা করি ভারতের ভবিষ্যৎ আশাভরসারূপী সহৃদয় পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকাগণ হেমপ্রভা ও প্রবোধের পুণ্যময় মহৎ আদর্শে অণুপ্রাণিত হইয়া ভারতের গৃহে গৃহে মাতৃতীর্থের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সম্পূর্ণ।